# न्यां छूतस्त्र धर्यं ७ वाकनीि



সম্পাদনা **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক** 

# নয়া তুরক্ষে ধর্ম ও রাজনীতি

# নয়া তুরস্কে ধর্ম ও রাজনীতি

সম্পাদনা **মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক** 



### নয়া তুরক্ষে ধর্ম ও রাজনীতি

সম্পাদনা: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০২২

প্রকাশক
সিএসসিএস পাবলিকেশস
কার্যালয় (অস্থায়ী):
এসই— ১৫, দক্ষিণ ক্যাম্পাস,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম-৪৩৩১।
ফোন: ০১৯৫৩ ৩২৩০৩০

ইমেইল: contact@cscsbd.com ওয়েবসাইট: cscsbd.com

> স্বত্ব সিএসসিএস পাবলিকেশন্স

> > মূল্য ২০০ টাকা মাত্র

NOYA TURUSKE DHORMA O RAJNITI (Religion & Politics in New Turkey), Edited by Mohammad Mozammel Hoque, Published by CSCS Publications, South Campus, Chittagong University. First published: October 2022, Copyright © CSCS Publications. BDT 200 only.

# সূচি

ভূমিকা

٩

<b>আধুনিক তুরক্কে ইসলাম: প্রেক্ষিত ও বর্তমান</b> আবিদুল ইসলাম চৌধুরী	77
কামালবাদের প্রথম পাঠ মাইদুল ইসলাম   অনুবাদ: আবিদুল ইসলাম চৌধুরী	২৫
আধুনিক তুরক্ষে ইসলামের পুনরুজ্জীবনকারী বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী আবিদুল ইসলাম চৌধুরী	૭১
<b>ফেতুল্লাহ গুলেন ও তাঁর আন্দোলন</b> মাইমুল আহসান খান   অনুবাদ: ইব্রাহীম হোসেন	৩৭
<b>ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণ নিয়ে গুলেনের দৃষ্টিভঙ্গি</b> অনুবাদ: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	8€
<b>গুলেন মুভমেন্ট ও ইসলাম</b> অনুবাদ: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	89
<b>ফেতুল্লাহ গুলেন ও সাঈদ নুরসীর মধ্যে পার্থক্য</b> রজব তাইয়েব এরদোয়ান   অনুবাদ: মুমিনুল ইসলাম চৌধুরী	88
<b>সেক্যুলার তুরক্ষে ইসলামপন্থীদের অভিজ্ঞতার বয়ান</b> আবিদুল ইসলাম চৌধুরী	৫৩

তুর্কি	পাবলিক	স্পেসে	ইসলাম	কীভাবে	ফিরে	আসছে?	৬৭
				নাজমু	দ সাবি	চব নির্বার	

নয়া তুরক্ষে ধর্ম ও গণতন্ত্র ৭৭ মোস্তফা আকিউল, ক্রিস্টা টিপেট | অনুবাদ: আবিদুল ইসলাম চৌধুরী

> একেপিতে আব্দুল্লাহ গুল আর নাই কেন? ১০১ মোস্তফা আকিউল | অনুবাদ: আবিদুল ইসলাম চৌধুরী

পলিটিক্যাল ইসলামের আবেদন কি সমাপ্তির পথে? ১০৫ তারিক রমাদান | অনুবাদ: আবিদুল ইসলাম চৌধুরী

# ভূমিকা

তুরস্ক বিশ্বসভ্যতার কেন্দ্র। ৬০০ বছরের মুসলিম খেলাফতের ইতিহাস। সেই দেশে ধর্ম ও রাজনীতির সমকালীন বোঝাপড়াটা কেমন, তা নিয়ে এই বই। এতে স্থান পেয়েছে এগারোটি প্রবন্ধ ও একটি সাক্ষাৎকার। এর কয়েকটি মৌলিক। অধিকাংশ অনুবাদ।

তুরস্ক নিয়ে বাংলা ভাষায় ইদানীং অনেক বইপত্র পাওয়া যায়। এক সময় এ বিষয়ে সাঈদ নুরসীর জীবনীভিত্তিক রচিত মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের বইটা ছাড়া খুব একটা ভালো বই বাংলা ভাষায় পাওয়া যেত না। সাম্প্রতিক সময়ে তুরস্ক নিয়ে বাংলা ভাষায় লেখা প্রকাশ করা শুরু করে 'সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্র' (সিএসসিএস)। ২০১৪ সালের দিকে।

১৯২৮ সালে খেলাফতের পতনের পর থেকে ২০১৬ সালে এরদোয়ানের বিরুদ্ধে ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের আগ পর্যন্ত মতাদর্শগত দিক থেকে তুরক্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ কোনদিকে কীভাবে গড়িয়েছে, তার একটা সামগ্রিক চিত্র এই বইয়ে ফুটে উঠেছে। এতদসত্ত্বেও এই বইয়ে উক্ত সময়কালের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আনটাচড রয়ে গেছে। তা হলো তুরক্ষের সুফীবাদ। অন্য কোনো সংকলনে এ বিষয়ে আলোকপাত করার আশা রাখি।

বিশ্বব্যাপী যারা ইসলামের পক্ষে কাজ করছেন, এখনকার পরিভাষায় যাদেরকে ইসলামিস্ট বলা হয়, তাদের জন্য 'তুর্কি মডেল' একটি গুরুত্বপূর্ণ ফেনোমেনা। ইসলামী আন্দোলনের ইখওয়ানুল মুসলিমীন ও জামায়াতে ইসলামীর যে ধারা, তুরক্ষের কার্যক্রম তার থেকে ভিন্নতর। সাঈদ নুরসী এখানে প্রধান ব্যক্তিত্ব। ফেতুল্লাহ গুলেনের কার্যক্রম তুরক্ষের সমাজ ও রাজনীতিতে রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। সেটির পক্ষে বা বিপক্ষে এখানে কিছু বলা হচ্ছে না। ২০১৬ সালের কুয়র সাথে গুলেনের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে এই বইয়ে সংগত কারণেই কিছু বলা হয়ন।

এই বইটিতে বরং কীভাবে আজকের তুরস্ক বিশ্ব দরবারে এভাবে উঠে আসলো, তার একটি ট্রেন্ডভিত্তিক চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই এখানে নাজমুদ্দীন এরবাকানের 'মিল্লি গুরুশ' উদ্যোগকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ফোকাস করা হয়েছে। এরবাকান হোজার অনুসারী হয়েও এরদোয়ান কীভাবে একজন সফল জাতীয় নেতা হয়ে উঠলেন, ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কী, এই বই পড়লে আপনি তা অনুমান করতে পারবেন।

যা বলছিলাম, ইসলামী আন্দোলনের মিশর ও উপমহাদেশকেন্দ্রিক ধারাগুলো যে সরলরৈখিক পথে চলেছে, তুরন্ধের 'ইসলামী আন্দোলন' সে পথে চলেনি। তারা বরং এডাপটেশনের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে। তাদের কাছে পতাকা বড় কিছু, দল বড় কিছু নয়, এমনকি দলের প্রাণপুরুষ প্রধান ব্যক্তিত্বও বড় কিছু নয়। তুরস্কের ইসলামপন্থীদের কাছে আদর্শ তথা ইসলামটাই কার্যত বড় কথা। মোস্ট ডিটারমাইনিং ফ্যাক্টর। এমনকি 'ইসলাম' নামটাকেও তারা বড় করে দেখেনি।

তাদের কাছে কাজের ইসলামটাই বড় কথা। নামটা প্রাসঙ্গিক মাত্র। নিছক তত্ত্ব, অতি আশাবাদ ও ধর্মভিত্তিক আবেগের পরিবর্তে তারা বুদ্ধিমন্তা, বাস্তবজ্ঞান, দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে। ব্যক্তিচরিত্র ও ব্যক্তিগত অবদানের মাধ্যমে তারা উদাহরণ তৈরি করেছে। গত একশ বছরে তুরক্ষে যারা ইসলামের জন্য কাজ করেছে তারা মুসলিম বিশ্বের অপরাপর জায়গাগুলোতে যে ধরনের আবেগবাদী চর্চা চলেছে সেই ধারাটাকে সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে তাদের দেশ ও সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সমকালীন বিশ্বে নিজেদের অবস্থান ইত্যাদি বিষয়কে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছে।

সাংগঠনিকভাবে তাদের মধ্যে যেসব দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ আছে তার প্রাবল্য যাই হোক না কেন, প্র্যাগমেটিক হওয়ার এই দিকটাতে তাদের তিনটা ধারাকেই আমার কাছে কমবেশি এক মনে হয়েছে।

তুরস্ক যেমন অন্যদের পরিবর্তে তাদের মাটি ও মানুষর বাস্তবতাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছে, তেমনি করে আমি মনে করি, তুরস্ক হতে বাংলাদেশেরও শেখার বিষয় হলো এই জিনিসটি। অর্থাৎ, নিজেদের বাস্তবতা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রকৃত অবস্থাকে মূল্যায়ন করে একটা নিজস্ব মডেল তৈরি করা। আমাদের নিজস্ব স্পেসিফিসিটিকে বিবেচনায় নিয়ে একটা 'বাংলাদেশ মডেল' তৈরি করার এই কাজে সিএসসিএস কন্ট্রিবিউট করছে। আলহামদূলিল্লাহ!

বইটি প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল ২০১৫ সালে। নানা কারণে দেরি হয়ে গেল। সে জন্য আমরা দুঃখিত। একবিংশ শতাব্দীর বিদ্যমান বাস্তবতায় ইসলামী আন্দোলনের নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চলছে দুনিয়ার আরো কিছু দেশে। তিউনিশিয়া এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। রশীদ ঘানুশী হলেন এর প্রাণপুরুষ। তাঁর আননাহদা মুভমেন্ট নিয়ে আমরা অনেক কাজ করেছি। সেগুলোরও একটা সংকলন শীঘ্রই প্রকাশ করবো, ইনশাআল্লাহ।

আবিদুল ইসলাম চৌধুরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে। ছাত্রজীবনে পার্টটাইম জব করতো 'সমাজ ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন কেন্দ্রে'। একটি মৌলিক প্রবন্ধ লেখাসহ এই বইয়ের অধিকাংশ প্রবন্ধ আবিদ অনুবাদ করেছে। বইটি প্রকাশের প্রাক্কালে, আবিদ, তোমাকে আমরা স্মরণ করছি। আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, আমীন।

'তুর্কি পাবলিক স্পেসে ইসলাম কীভাবে ফিরে আসছে?' শীর্ষক সাড়া জাগানো প্রবন্ধটি সিএসসিএস থেকে প্রকাশ করার জন্য স্নেহভাজন নাজমুস সাকিব নির্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যার হাতের ছোঁয়া ছাড়া সিএসসিএস'র কোনো লেখা প্রকাশ হয় না, সেই সর্বকাজের কাজী, সিএসসিএস'র নির্বাহী পরিচালক মাসউদুল আলমকে এই সুবাদে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অধিকতর বৈরী পরিবেশ সত্ত্বেও কীভাবে কাজ করতে হয়, তুরস্ক থেকে তা আমরা শিখতে পারি। আশা করি, এই কাজে 'নয়া তুরস্কে ধর্ম ও রাজনীতি' বইটি বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সিএসসিএস পাবলিকেশন্স হতে বইটি প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি।

### মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

৩০ এপ্রিল ২০২১ এসই-১৫, দক্ষিণ ক্যাম্পাস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

# আধুনিক সুরস্কে ইসলাম: প্রেক্সিত ও বর্তমান

### আবিদুল ইসলাম চৌধুরী

আজকের মধ্যপ্রাচ্য ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্যের শাসনাধীন ছিল। সপ্তম শতাব্দী অর্থাৎ ওমরের (রা.) শাসনামল হতে রোমানদের শক্তি খর্ব হতে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় ১০৪৮ সালের যুদ্ধে সেলজুক তুর্কি মুসলিমরা এশিয়া মাইনরে (তুরস্ক ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল) বাইজেন্টাইনকে (রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল) পরাজিত করে। ১০৭১ সালের ২৬ আগস্ট সংঘটিত মান্যিকার্টের যুদ্ধে জয় লাভের মাধ্যমে তুরস্কে সেলজুক শাসন পাকাপোক্ত হয়।

তবে কয়েক শতান্দী পরেই সেলজুকরা দুর্বল হতে শুরু করে। আনাতোলিয়ার (তৎকালীন সময় থেকে শুরু করে খেলাফতের পতনের আগ পর্যন্ত বর্তমান তুরস্কের ইস্তাম্বুল বাদে এশীয় অংশটুকু আনাতোলিয়া নামে পরিচিত ছিল) ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর সাথে তাদের বিচ্ছিন্নতা বাড়তে থাকে। মোঙ্গলদের সাথেও শক্তির ভারসাম্যে তারা ক্রমশ পিছিয়ে যেতে থাকে। অপরদিকে, উসমান গাজীর বাহিনী তুরস্কের সর্ব পশ্চিমের নগর বুরসাতে বাইজেন্টাইনদের বিভিন্ন দুর্গ দখল করে দ্রুত শক্তি অর্জন করতে থাকে। ধীরে ধীরে তারা এ অঞ্চল থেকে সেলজুকদের হটিয়ে দিয়ে প্রভাব বাড়াতে থাকে। ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) জয় করার মধ্য দিয়ে উসমানীয় খেলাফত পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী সামাজ্য হিসেবে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করে।

### ভৌগোলিক অবস্থান

ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব ও এশিয়ার পশ্চিমে তুরস্ক অবস্থিত। দেশটির পশ্চিমাংশের

<sup>2</sup> R.G. Grant, *Battle a Visual Journey through 5000 Years of Combat* (London: Dorling Kindersley, 2005), 77.

বসফরাস প্রণালী থেকে শুরু করে পুরো ইস্তাম্বুল শহরটি পড়েছে ইউরোপের অংশে। উত্তর দিকের সীমান্ত ঘেঁষে জর্জিয়া ও বুলগেরিয়ার মাঝামাঝি রয়েছে কৃষ্ণসাগর। এছাড়া পশ্চিম-দক্ষিণাংশে গ্রীস ও সিরিয়ার মাঝামাঝি আছে ইজিয়ান ও ভূমধ্যসাগর। পূর্ব-দক্ষিণাংশের সীমানায় অবস্থান করছে ইরাক, ইরান, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া।

### খেলাফতের পতন

প্রায় সাড়ে চার'শ বছর ধরে এশিয়ার বৃহদাংশ, উত্তর আফ্রিকা এবং ইউরোপের বলকান ও ককেশাস অঞ্চলে উসমানীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই উসমানীয় খেলাফতের প্রতাপ কমতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তা বিলীন হতে শুরু করে। মূলত বলকান অঞ্চলে নিজের আধিপত্য ধরে রাখতে ১৯১৪ সালে খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। ঐতিহাসিক দ্বন্দের কারণে তিনি রাশিয়ার বিপরীতে জার্মানির পক্ষে অবস্থান নেন। শেষ পর্যন্ত সব অঞ্চল হারিয়ে উসমানীয় খেলাফত শুধু তুরক্ষে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তারপরও ইউরোপীয় প্রতিবেশীরা পরাজিত তুরস্ককে পুরোপুরি দখল করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। এ লক্ষ্যে ইউরোপীয় সৈন্যদলগুলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেও তুরক্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করছিল।

এমতাবস্থায়, খলিফা ষষ্ঠ মোহাম্মদ ইউরোপের হাত থেকে তুরক্ষের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে 'গেলিপোল্লি' যুদ্ধের নায়ক মোস্তফা কামাল পাশাকে ১৯১৯ সালের ৩০ এপ্রিল সেনাবাহিনীর নবম ডিভিশনের 'জেনারেল ইন্সপেক্টর' হিসেবে নিয়োগ দেন। ২ তবে খলিফার সাথে দ্বিমত করে ৮ জুলাই তিনি সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন। উসমানীয় সরকার তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যুদগুদেশ দিলেও তিনি রক্ষা পেয়ে যান।

ওই বছরই উসমানীয় সরকারের সর্বশেষ নির্বাচনে কামালের দল বিজয়ী হয়। পরবর্তীতে বৃটিশরা তুরস্কের 'মিশাক-ই-মিল্লা' (জাতীয় ঐক্যের ঘোষণা) ভেঙ্গে দিলে কামাল পাশা 'গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি' (জিএনএ) প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় নির্বাচনের ডাক দেন। জিএনএ প্রতিষ্ঠিত হলে উসমানীয় সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে দেশে

\_

Andrew Mango, *Ataturk: The Biography of the founder of Modern Turkey* (London: John Murray Publishers, 1999), 214.

<sup>°</sup> উসমানীয় পার্লামেন্টের শেষ টার্মে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ছয়টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যা 'মিশাক-ই-মিল্লি' নামে পরিচিত। গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো ১৯২০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি জনগণের কাছে প্রকাশ করা হয়।

আরেকটি কর্তৃপক্ষের দ্বৈত শাসন চালু হয়।<sup>8</sup>

বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেয়া সেভরে চুক্তি (১৯২০) প্রত্যাখান করে জিএনএর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করা হয়। ১৯২১ সালের ৫ আগস্ট কামাল পাশাকে সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ করা হয়। ১৯২২ সালে গ্রিস-তুরস্ক যুদ্ধে তুরস্ক চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে। যুদ্ধে জয়ের ফলে জিএনএ আরো প্রভাবশালী হয়ে উঠে। পরিণতিতে উসমানীয় খলিফা জিএনএর হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে বাধ্য হন। ১৯২২ সালের ১ নভেম্বর উসমানীয় খেলাফতের অবসান ঘোষণা করা হয়। তবে মুসলিম সেন্টিমেন্টকে অনুকূলে রাখতে দ্বিতীয় আব্দুল মজিদকে প্রতীকী খলিফা হিসেবে বহাল রাখা হয়।

১৯২৩ সালের ২৯ অক্টোবর জিএনএ কামাল পাশাকে প্রেসিডেন্ট এবং তুরস্ককে 'প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র' হিসেবে ঘোষণা করে। তারপর প্রতীকী খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল মজিদকেও নির্বাসনে পাঠিয়ে ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ উসমানীয় খেলাফতকে চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

### প্রজাতান্ত্রিক শাসনে তুরস্ক

কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরক্ষে প্রজাতান্ত্রিক শাসনের নামে শুরু হয় একনায়কতন্ত্রের শাসন। পাশ্চাত্যের 'আধুনিকতা'র সাথে তাল মেলাতে জনগণের উপর সেকুগুলারিজমের আবরণে ধর্মহীনতা চাপিয়ে দেয়া হয়। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলাম অনুসারীদের উপর নেমে আসে ভয়াবহ নির্যাতন। কোরআন শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়। মসজিদে আরবীতে আযান নিষিদ্ধ করে তুর্কি ভাষায় আযানের প্রচলন করা হয়। তুর্কি ভাষা থেকে আরবী বর্ণমালা বাদ দিয়ে ল্যাটিন বর্ণমালা চাল করা হয়।

১৯৪৩ সালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল তুরস্ক সফরকালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইসমত ইনোনুর সাথে বৈঠক করে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার তাগাদা দেন। ১৯৪৬ সালে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তিত হলে রিপাবলিকান পিপলস পার্টির এমপি জালাল বায়ার ও আদনান মেন্দারিস প্রতিষ্ঠা করেন ডেমোক্রেটিক পার্টি। ১৯৫০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আদনান মেন্দারিস আরবীতে আযানের অনুমতি প্রদান করেন। পাশাপাশি কোরআন শেখা ও নামায পড়ার অনুমতিসহ মুসলিমদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চর্চার উপর থেকে বেশকিছ বিধিনিষেধ তুলে নেন।

মেন্দারিস সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদের শেষদিকে অর্থাৎ ১৯৬০ সালে সেনাপ্রধান

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ahmad Feroz, *The Making of Modern Turkey* (London: Routledge, 1993), 50.

জেনারেল গুরসেল অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সামরিক শাসন জারি করেন। সামরিক আদালতে আদনান মেন্দারিসের বিরুদ্ধে তুরস্কের সেকুগুলার শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা ও আরবীতে আযান পুনঃপ্রতিষ্ঠার অভিযোগ আনা হয়। এক সংক্ষিপ্ত বিচারে তাঁকে মৃতুদণ্ড প্রদান করা হয়। মেন্দারিসকে ফাঁসি দেয়ার ঘটনায় পুরো জাতি শোকাহত হলেও সেনাবাহিনীর ভয়ে তারা বিক্ষোভ থেকে বিরত থাকে। সামরিক শাসন পরবর্তী ১৯৬৫ সালের ১০ অক্টোবরের নির্বাচনে সুলাইমান দেমিরিলের 'আদালত পার্টি' (True Path Party) সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করে।

### বদিউজ্জামান নুরসীর প্রভাব

কামাল পাশার একনায়ক সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মহীনতা চাপিয়ে দেয়ার কারণে জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারগুলো খর্ব হতে থাকে। সে সময় তুরস্কের কয়েকজন আলেম এসব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী।

১৮৭৭ সালে বিৎলিস প্রদেশের নুরস গ্রামে জন্ম নেয়া সাঈদ নুরসী ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারী। মাত্র ১৪ বছর বয়সেই তিনি সফলতার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯১৩ সালে তুরস্কের ভ্যান প্রদেশে তিনি জেহরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম বিশ্বযদ্ধের শুরুতে নিরপেক্ষ থাকলেও পরবর্তীতে খেলাফত রক্ষার তাগিদে যুদ্ধে যোগ দেন। তাঁর ছাত্রদের নিয়ে গঠন করেন আধাসামরিক বাহিনী। জ্ঞান অর্জনে তিনি যেমন অসাধারণ, তেমনি যদ্ধক্ষেত্রেও ছিলেন প্রচণ্ড সাহসী। তুরস্কের পূর্বাঞ্চলের পাসিলোনা ফ্রন্টে রাশিয়ান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁর বাহিনী নিয়ে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে বন্দি হন নুরসী। তবে যুদ্ধ শেষে রাশিয়ান কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে দেশে ফিরে আসতে সক্ষম হন। সরকারের ইসলাম নিধন কার্যক্রমের বিরোধিতা ও পরবর্তীতে 'শেখ সাঈদ বিদ্রোহে' প্ররোচনার অভিযোগে তিনি গ্রেফতার হন। অথচ তিনি 'সাঈদ বিদ্রোহ' থামাতে চেষ্টা চালিয়েছিলেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় আরো অনেকবার তাঁকে গ্রেফতার ও নির্বাসনে পাঠানো হয়। কষ্টকর নির্বাসন ও কারান্তরীণ অবস্থায় তিনি বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'রিসালায়ে নুর' রচনার কাজ সম্পন্ন করেন। এই তাফসীর গ্রন্থটিতে তিনি ইসলাম সম্পর্কে যুক্তিভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বস্তুবাদ ও কমিউনিস্ট চিন্তাধারার মোকাবেলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত এবং এসব মতবাদের সাথে ইসলামের পার্থক্য যক্তি দিয়ে তুলে ধরেন।

১৯১৯ সালের পর রাজনীতি থেকে দূরে থাকা নুরসী ১৯৫০ সালের দিকে পুনরায় রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি কট্টরপন্থী সেক্যুলারদের বিপরীতে ডেমোক্রেটিক পার্টিকে সমর্থন করেছিলেন। কারণ, ডেমোক্রেটরা ধর্ম ও মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে ছিল অনেকটা উদার। এ ব্যাপারে তাঁর ছাত্ররা প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দেন, ডেমোক্রেটিক পার্টি পরাজিত হলে কউর সেকুলার এবং জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতা দখল করবে। ফলে সামাজিক ও জাতীয় জীবনে এক বড় বিপর্যয় নেমে আসবে। তারা যাতে ক্ষমতা দখল করতে না পারে, তাই আমি আদনান মেন্দারিসকে অর্থাৎ ডেমোক্রেটিক পার্টিকে দেশ, ইসলাম ও কোরআন রক্ষার স্বার্থে সমর্থন দিয়েছি।

তবে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেননি। বরং ইসলামের সামাজিক কার্যক্রম জোরদার করতে থাকেন। যা পরবর্তীতে ইসলামপন্থী রাজনীতির জন্য শক্তিশালী 'ভিত্তি' হিসেবে কাজ করে। সাঈদ নুরসী জীবনে বহু প্রতিকূলতা মোকাবেলা করেছেন। এমনকি কারাগারে তাঁর খাবারে বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টাও করা হয়। ১৯৬০ সালের ২৩ মার্চ তুরক্ষের এই মহান ব্যক্তিত্ব ইন্তেকাল করেন।

### মিল্লি গুরুশ: ইসলামপন্থীদের সম্মিলিত ইশতেহার

প্রখ্যাত প্রকৌশলী ড. নাজমুদ্দীন এরবাকান সমসাময়িক আলেমদের সমর্থনে ১৯৬৯ সালে স্বতন্ত্রভাবে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে নির্বাচিত হন। একই বছর তিনি 'মিল্লি গুরুশ' (National Vision) শিরোনামে একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে এটি একই নামে একটি ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। এখন পর্যন্ত এটি পুরো ইউরোপ জুড়ে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় সংগঠন। এই ইশতেহারের আলোকে ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'মিল্লি নিজাম পার্টি'। কিন্তু এক বছর পরই সেকুগুলার সরকার দলটি নিষিদ্ধ করে দেয়। তারপর তিনি গঠন করেন 'মিল্লি সালামত পার্টি'। ১৯৭৪ সালে নির্বাচনে জয়ী হয়ে দলটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। পরবর্তীতে এই দলটিও নিষিদ্ধ হলে যথাক্রমে গঠিত হয় রেফাহ পার্টি, ফজিলেত পার্টি, সাদাত পার্টি। প্রতিটি দলই মিল্লি গুরুশের মতাদর্শকে গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মিল্লি গুরুশ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল:

- অর্থনৈতিক ভিত্তি অর্জন।
- আধ্যাত্মিক উন্নতি। ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া জাতিকে পুনরায়

<sup>e</sup> Recep Tayyip Erdoğan, (2 March, 2014), *Başbakan Erdoğan'dan Fethullah Gülen'e Said Nursi Çıkışı* [Video Post]. Retrieved from www.voutube.com/watch?v=LTzTWx1sOJQ

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Fulya Atacan, "Explaining Religious Politics at the Crossroad: AKP-SP," *Turkish Studies* 6, no. 2 (2005): 187–188.

ইসলামের দিকে আহ্বান ও তাদেরকে যোগ্য মুসলিম রূপে গড়ে তোলা। বিশেষ করে যুবকদের মাঝে ইসলামের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি করা।

 ইসলামী ইউনিয়ন গড়ে তোলা ও মুসলমানদেরকে এক প্লাটফরমে নিয়ে এসে সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করা।

### ১৯৭০-২০০০: এরবাকানের সংগ্রাম

মিল্লি গুরুশের রাজনৈতিক শাখা হিসেবে এরবাকান ১৯৭০ সালের ২৬ জানুয়ারি 'মিল্লি নিজাম পার্টি' গঠন করেন। বছরখানেকের মধ্যেই একে ইসলামী মৌলবাদীদের দল হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। সেক্যুলারিজম সংক্রান্ত সংবিধানের একটি ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগে দলটিকে ১৯৭১ সালের ২০ মে নিষিদ্ধ করা হয়।

তারপর ১৯৭২ সালের ১১ অক্টোবর এরবাকান 'মিল্লি সালামত পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ১৯৮০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর কোনিয়া শহরে 'আল-কুদস' দিবস উপলক্ষ্যে সমাবেশ পালনের অভিযোগে ১২ সেপ্টেম্বর সামরিক ক্যু করে এই পার্টিকেও নিষিদ্ধ করা হয়। একই সাথে দেশে সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়। ১৯৮২ সালে এক বিতর্কিত গণভোটের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে সংবিধান সংশোধন করা হয়। ১৯৮৩ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে 'মাদারল্যান্ড পার্টি'র একদলীয় শাসন শুরু হয়।

ব্যক্তি এরবাকানের উপর রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও তিনি দমে যাননি। ১৯৮৩ সালে গোপনে তিনি 'রেফাহ পার্টি' গঠন করেন। অল্প সময়ের ব্যবধানে এটিও জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৮৭ সালে তাঁর উপর থেকে রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর তিনি আবারো প্রকাশ্য রাজনীতিতে ফিরে আসেন এবং পার্টির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালের স্থানীয় মেয়র নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করেন। তবে প্রথম বর্ষপূর্তির আগেই তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

নাজমুদ্দীন এরবাকানের ১১ মাসের শাসনামল নানা মাত্রায় সাফল্যমণ্ডিত। এ সময় ডি-৮ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি কূটনৈতিক বিচক্ষণতা প্রদর্শন করেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি আরব রাষ্ট্রসমূহ এবং ফিলিস্তিনের সাথে সম্পর্কের ব্যাপক উন্নতি ঘটান। এছাড়া দেশের অর্থনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে সুদের হার কমানোসহ গঠনমূলক নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার দিকে মনোযোগী হন।

রেফাহ পার্টির এসব সফলতা সেক্যুলারিস্টদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরবাকান ও তাঁর পার্টি শরীয়া কায়েম করবে— এহেন অভিযোগে তাঁকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য সেনাবাহিনীকে উস্কানি দেয়া হয়। পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে ১৯৯৭ সালের ৩০ জুন এরবাকান সেনাবাহিনীর কাছে ক্ষমতা তুলে দিতে বাধ্য হন।

১৯৯৮ সালে সাংবিধানিক আদালত রেফাহ পার্টিকে নিষিদ্ধ করে। পাশাপাশি এরবাকানকেও রাজনীতি থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু তিনি মিল্লি গুরুশের অপর নেতা রেকাই কুতানের মাধ্যমে 'ফজিলেত পার্টি' গঠন করেন। ২০০১ সালে সাংবিধানিক আদালত এ দলটিকেও নিষিদ্ধ করে। তারপর ফজিলেত পার্টির সদস্যরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যান।

পার্টির নেতৃত্বে থাকা অপেক্ষাকৃত তরুণ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা ২০০১ সালে গঠন করে 'জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি' (একেপি)। অধিকতর রক্ষণশীল অন্য সদস্যরা গঠন করে মূলধারার ইসলামী আন্দোলনধর্মী সংগঠন 'সাদাত পার্টি'।

২০০১ সালের ২০ জুলাই যাত্রা শুরু করা সাদাত পার্টি রয়ে যায় ইসলামী দল হিসাবে। আর একেপি আগের দৃষ্টিভঙ্গি পালেট উদার ও মধ্যপন্থী হিসেবে গড়ে ওঠে। অবশ্য 'আমরা সবাই মিল্লি গুরুশ ও আমরা হলাম এর পরবর্তী প্রজন্ম' স্লোগান দিয়ে জনগণের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসে একেপি।

রাজনীতি থেকে সাময়িকভাবে দূরে থাকলেও ড. এরবাকান একেপি এবং সাদাত— উভয় পার্টির তাত্ত্বিক নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এ কারণে এরবাকানের বিরুদ্ধে বাম ও সেকুগুলারদের অভিযোগ ছিল, তিনি দুই দল দিয়েই দেশ চালাচ্ছেন। এক দল দেশ শাসন করছে, আর অন্য দলটি সামাজিক কাজ ও ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত। পরবর্তীতে সাদাত পার্টিতে নেতৃত্ব নিয়ে নানা জটিলতার সৃষ্টি হলে ৮৪ বছর বয়সে ২০১০ সালে এরবাকান সাদাত পার্টির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় ২০১১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তিনি ইস্তেকাল করেন।

### এক নজরে তুরক্ষের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল

The Republican People's Party (CHP): ১৯২৩ সালে মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের হাতে গড়া এই রেডিক্যাল সেকু্যুলার দলটি ১৯৩৮ সালের পর জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। বর্তমানে মধ্য-বামপন্থী হিসেবে পরিচিত দলটি কামালের 'সোশ্যাল ডেমোক্রেসি' আদর্শের অনুসারী। ২০১১ সালের সাধারণ নির্বাচনে ২৫.৯৮ শতাংশ ভোট পেয়ে দলটি দ্বিতীয় অবস্তানে আছে।

- National Action Party (MHP): ১৯৬৯ সালে Alparslan Türkes
  এই কট্টর জাতীয়তাবাদী দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। দলটি 'গ্রে উলভস' নামেও
  পরিচিত। প্যারা মিলিটারি কাঠামোর আদলে গড়া এই দলটিকে সত্তরের
  দশকে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী করা হয়। তবে ২০১১ সালের
  নির্বাচনে ১৩.০১ শতাংশ ভোট পেয়ে দলটি তৃতীয় স্থান দখল করেছে।
- The Motherland Party (ANAP): ১৯৮৩ সালে Turgut Özal-এর হাত ধরে প্রতিষ্ঠা পায় মাদারল্যান্ড পার্টি। মধ্য-ডানপন্থী এই দলটি ডিওয়াইপির সাথে কোয়ালিশন করে ১৯৮৩ থেকে ৯১ সাল পর্যন্ত আট বছর ক্ষমতাসীন ছিল। ক্ষমতায় থাকাকালে দলটি প্রাইভেটাইজেশনকে প্রমোট করতে অর্থনৈতিক সংস্কারের পদক্ষেপ নেয়।
- The True Path Party (DYP): ১৯৮৩ সালে সুলাইমান দেমিরেলের হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হয় দলটি। রাজনৈতিকভাবে মধ্য-ডানপন্থী দলটি উদার অর্থনীতি ও রক্ষণশীল আদর্শকে লালন করে। ২০০৭ সালে তারা Damocrate Party (DP)-র সাথে একীভূত হয়ে নির্বাচন করলেও ২০১১ সালে আলাদা হয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়। এই নির্বাচনে দলটি ০.১৫ শতাংশ ভোট পায়। অন্যদিকে ডিপি পায় ০.৬৫ শতাংশ।
- The Democratic Left party (DLP): ১৯৮৫ সালে Rahsan Ecevit দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। মধ্য-বামপন্থী এই দলটি ন্যাটোর সদস্যপদ গ্রহণ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানে সরকারী পদক্ষেপগুলোর কড়া সমালোচক। দলটি সিএইচপির রাজনৈতিক মিত্রও বটে। ২০১১ সালের সংসদ নির্বাচনে দলটি ০.২৫ শতাংশ ভোট লাভ করে।
- The Virtue (Fazilet) Party: সাংবিধানিক আদালত ১৯৯৮ সালের জানুয়ারিতে রেফাহ পার্টিকে নিষিদ্ধ করলে এরবাকান তাৎক্ষণিকভাবে রেকাই কুতানের নেতৃত্বে এই দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। রেফাহ পার্টির জনপ্রিয়তা কাজে লাগিয়ে ১৯৯৯ সালের নির্বাচনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত দলটি ১১১ আসনে জয় লাভ করে। কিন্তু ২০০১ সালে এই দলটিকেও নিষিদ্ধ করা হয়।
- Felicity (Saadat) Party: নিষিদ্ধ ঘোষিত ফজিলেত পার্টির সদস্যদের একটি অংশ ২০০১ সালে গঠন করে সাদাত পার্টি। একেপি উদারপন্থী হলেও সাদাত পার্টি রক্ষণশীল ইসলামপন্থী দল হিসেবে থেকে যায়। এছাড়া রাজনৈতিক ইস্যুতে তারা একেপি সরকারের অন্যতম সমালোচক। ২০১১ সালের নির্বাচনে ১.২৭ শতাংশ ভোট পেয়ে দলটি পঞ্চম স্থানে আছে।

- Justice and Development Party (AKP): ২০০১ সালে আব্দুল্লাহ গুল ও এরদোয়ানের নেতৃত্বে ফজিলেত পার্টির সংস্কারপন্থীদের নিয়ে দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থনৈতিক উদারতাবাদ ও সামাজিকভাবে রক্ষণশীল এই দলটি ২০০২ সাল থেকে টানা নির্বাচিত হয়ে আসছে। ২০১১ সালের সংসদ নির্বাচনে দলটি ৪৯.৮৩ শতাংশ ভোট পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ফলে তুরস্কের রাজনীতিতে একেপি মূলধারার মধ্যডানপন্থী দলে পরিণত হয়েছে। এছাড়া ইসলামী আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমধারা নীতি অবলম্বনের কারণে দলটি উদার-ইসলামপন্থী হিসেবেও পরিচিতি পেয়েছে।
- People's Voice Party (PVP): ২০১০ সালের ১ নভেম্বর Numan Kurtulmuş এই দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। তুর্কি ভাষায় যার সংক্ষিপ্ত নাম HSP। রক্ষণশীলতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গড়ে উঠা দলটি ২০১২ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর নিজে থেকেই কার্যক্রম গুটিয়ে নিয়ে একেপির সাথে একীভৃত হয়ে যায়।

### গুলেনের 'হিজমেত' আন্দোলন

ফেতুল্লাহ গুলেনের হাত ধরে তুরস্কে ১৯৬০ সালের দিকে শুরু হওয়া আন্দোলন হিজমেত বা স্বেচ্ছাসেবী আন্দোলন নামে পরিচিত। শিক্ষা, গণমাধ্যম, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ইত্যাদি নানা ধরনের সামাজিক কার্যক্রম তারা পরিচালনা করে। এই আন্দোলনের আওতায় সেকু্যুলার কারিকুলাম অনুসারে তুরস্কে তিন শতাধিক এবং বিশ্বের ১৪০টি দেশে সহস্রাধিক স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া তুর্কি ও ইংরেজি ভাষায় বেশ কয়েকটি প্রভাবশালী প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া প্রতিষ্ঠান এই আন্দোলনের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে Cihan News Agency'র মতো প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক মিডিয়া গ্রুপও রয়েছে। নব্বইয়ের দশকে হান্টিংটনের 'সভ্যতার সংঘাত' তত্ত্বের বিপরীতে গুলেনের 'আন্তঃধর্মীয় সংলাপ' এই আন্দোলনকে বেশ জনপ্রিয় করে তোলে। ১৯৯৮ সালে ফেতুল্লাহ গুলেনের আয়োজনে দেশের সেকু্যুলার ও ইসলামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটি সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। যা দেশে-বিদেশে সবার নজর কাডে।

সরাসরি সক্রিয় না হওয়া সত্ত্বেও তুরক্ষের রাজনীতিতে এই আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব দেখা গেছে বিভিন্ন সময়ে। ইসলামের অনুকূলে এরবাকান সরকার কর্তৃক

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Alexandra Hudson, (14 May, 2008), *Turkish Islamic preacher — threat or benefactor?* [News]. Retrieved from https://www.reuters.com/article/featuresNews/idUKL0939033920080514

গৃহীত নানা পদক্ষেপের কঠোর সমালোচক ছিলেন ফেতুল্লাহ গুলেন। তবে একেপি গঠন ও একেপি সরকারের প্রাথমিক পর্যায়ে সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল গুলেন আন্দোলন। সেক্যুলার সংবিধানের মূলনীতি মেনে চলা, মুক্তবাজার অর্থনীতি ও চ্যারিটিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক গতিশীলতা আনয়ন— এসব ইস্যু উভয়ের মধ্যে ঐক্যুমত গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

### নতুন সহস্রাব্দের উল্লেখযোগ্য ঘটনা

- ২০০২ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনে একে পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আইনি জটিলতা কাটিয়ে রজব তাইয়েব এরদোয়ান ২০০৩ সালের ১৪ মার্চ তুরক্ষের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
- ২০০৭ সালের এপ্রিলে সেক্যুলাররা এরদোয়ানের ইসলামী ব্যাকগ্রাউন্ডের বিরোধিতা করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তবে ধর্মীয় উদারতা ও কুর্দীদের প্রতি সহনশীল নীতি অবলম্বনের ফলে সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠী ও কুর্দীদের মধ্যে জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। ওই বছরের নির্বাচনে সাডে ৪৬ শতাংশ ভোট পেয়ে একেপি জয় লাভ করে।
- বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে হেডস্কার্ফ পরিধানের অনুমতি দিয়ে সংসদে পাস হওয়া
  একটি আইন ২০০৮ সালের জুন মাসে বাতিল করে দেয় তুরস্কের
  সাংবিধানিক আদালত। অবশ্য আন্দোলনের মুখে পরবর্তী কয়েক বছরের
  মধ্যে এ ব্যাপারে আইন কিছুটা শিথিল করা হয়।
- ২০১০ সালের মে মাসে তুরস্ক অবরুদ্ধ গাজায় 'ফ্লোটিলা' নামক ত্রাণবাহী জাহাজ পাঠায়, যা ইসরাইলি হামলার শিকার হয়। একই বছরের জুলাইয়ে সেনাবাহিনীর সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ১৯৬ জনকে ক্যু করে ক্ষমতা দখল প্রচেষ্টার জন্য আদালত অভিযুক্ত করে।
- ২০১০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর সংবিধান সংশোধনের জন্য অনুষ্ঠিত গণভোটে সেনাবাহিনী ও সাংবিধানিক আদালতের অগণতান্ত্রিক ক্ষমতা সংকুচিত করা, কিছু স্বৈরতান্ত্রিক ধারায় পরিবর্তন আনা এবং ইইউর সদস্যপদ অর্জনসহ ২৬টি ধারা সম্বলিত একটি প্যাকেজ প্রস্তাব পাশ হয়। যদিও ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার গোপন কূটনীতির কারণে ইইউতে তুরক্ষের সদস্যপদ

Berna Turam, (13 March, 2014), *Gulen, Erdogan and democracy in Turkey* [Opinion]. Retrieved from https://www.aljazeera.com/opinions/2014/3/13/gulen-erdogan-and-democracy-in-turkey/

আটকে আছে বলে নভেম্বর মাসে উইকিলিকসের ফাঁস করা এক নথি থেকে জানা যায়।

- ২০১১ সালের ১২ জুনের বহুল আলোচিত নির্বাচনে একেপি প্রায় ৫০
   শতাংশ ভোট পেয়ে তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠনের জন্য নির্বাচিত হয়।
- ২০১৩ সালে একেপি ও গুলেনের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপ নেয়। মে-জুন মাসে সেক্যুলারদের সরকারবিরোধী আন্দোলন কয়েকটি শহরে ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে দেশে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। ডিসেম্বর মাসে দুর্নীতির অভিযোগে এরদোয়ান সরকারের তিন মন্ত্রী পদত্যাগ করে, যা ঐ সময় সরকারকে কিছুটা হলেও বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়।
- ২০১৪ সালের মার্চে গুলেন নিয়য়্রিত সকল প্রতিষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে সংসদে বিল পাশ হয়।
- ২০১৩ সালের সরকারবিরোধী আন্দোলনে আহত এক যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র
  করে পুনরায় দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। তা সত্ত্বেও ২০১৪
  সালের আগস্টে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এরদোয়ান নির্বাচিত হন।
- ইরাক ও সিরিয়ার কিছু অংশ নিয়ে গড়ে উঠা কট্টরপন্থী গ্রুপ আইএসআইএস দমনে ২০১৪ সালের অক্টোবরে ন্যাটোর সাথে শর্তসাপেক্ষে যুক্ত হতে সম্মত হয়় তুরয়য়।

### একেপির সফলতা

এরদোয়ানের শাসনামলে তুরস্কের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিশ্ময়করভাবে বেড়েছে। ক্রয় সক্ষমতা (পিপিপি) অনুযায়ী তুরস্কের জিডিপি এখন ১.১৬৭ ট্রিলিয়ন ডলার। ২০১৪ সালে মাথাপিছু আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৪৯৫ ডলারে।  $^{\circ}$ 

তুরক্ষের এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মধ্য-এশিয়াসহ মুসলিম বিশ্বে বিনিয়োগ বাড়াতে সাহায্য করেছে। ২০১২ সালে তুরক্ষ মুসলিম বিশ্বে বিনিয়োগ করেছিল ২২২ বিলিয়ন ডলার। এছাড়া ২০১৩ সালের হিসাবে, তুরক্ষ মুসলিম বিশ্বে মানবাধিকার সহায়তা প্রদান করে ১.৯ বিলিয়ন ডলার। যেখানে সৌদি আরব করেছিল ১.৬ বিলিয়ন ডলার। বৈশ্বিকভাবে মানবাধিকার সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে তুরক্ষের (১.০৪ বিলিয়ন ডলার)

Turkey: OECD Data, (18 December, 2014), Retreived from htttp://data.oecd.org/turkey.htm

### অবস্থান চতুর্থ ৷<sup>১০</sup>

একেপির জনপ্রিয়তার মূল কারণ হচ্ছে, যারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নয় তারাই এ দলের নেতৃত্বে রয়েছে। ফলে দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্রগঠনে একেপির ভূমিকাকে জনগণ সমর্থন করে। 'ইসলাম গণতন্ত্রের শত্রু নয় কিংবা গণতন্ত্র ইসলামের বিরোধী নয়'— এই বিষয়টি একেপি বাস্তবায়ন করে দেখাতে পেরেছে।

তারা সীমিত পরিসরে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যবস্থা ও এর আধুনিকায়ন করেছে। প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সরকারের সহযোগিতায় নারীরা হিজাব পরার অধিকার ফিরে পেয়েছে। এছাড়া ২০১৪ সালে গাজায় ইসরাইলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও একেপি জোরালো অবস্থান নিয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সেখানকার বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করতে পিছপা হয়নি।

### পর্যালোচনা

- সেকুগোরিজমের ঝড়: সেকুগোরিজমের তিনটি মডেল বিভিন্ন দেশে চর্চা
  হচ্ছে: রেডিক্যাল ফ্রেঞ্চ মডেল, মডারেট বৃটিশ মডেল ও লিবারেল
  আমেরিকান মডেল। আধুনিকতার নামে ফ্রেঞ্চ রেডিক্যাল সেকুগোরিজমের
  মডেলটি কঠোরভাবে তুরক্ষের জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল।
  অন্য কোনো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের জনগণকে এ রকম প্রাতিষ্ঠানিক
  ধর্মবিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি।
- অরাজনৈতিক ধর্মীয় গণশিক্ষা পদ্ধতি: রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত চরম ধর্মবিরোধী
  নীতির প্রেক্ষিতে বিদউজ্জমান নুরসী ইসলাম সম্পর্কে আপাতদৃষ্টিতে
  রাজনীতি-নিরপেক্ষ ধর্মীয় শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণ করেন। ফলে তুরক্কের
  সমাজ ইসলামী মূল্যবাধে উজ্জ্বীবিত হয়ে উঠে এবং ইসলামের প্রভাব
  ক্রমাম্বয়ে শক্তিশালী হতে থাকে। এক পর্যায়ে রাষ্ট্র আরোপিত ধর্মহীনতাবাদ
  ক্রমাম্বয়ে সহনশীল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে রূপ লাভ করে।
- ধর্ম সমর্থনকারীদের দৃশ্যমান নীতিগত ঐক্য: চরম প্রতিকূল অবস্থায়
   এরবাকানের মিল্লি গুরুশকে কেন্দ্র করে ইসলামপন্থীদের মধ্যে আদর্শ ও
   নীতিগত যে ঐক্য-চেতনা গড়ে উঠে, তা মোটাদাগে এখনো সক্রিয়। বিভিন্ন

David Lepeska, (25 April, 2014), *Turkey's rise from aid recipient to mega-donor*, [Opinion]. Retrived from http://america.aljazeera.com/opinions/2014/4/turkey-internationalaidafricasomaliamiddleeasterdorgan.html

সময়ে রাজনৈতিক ব্যাপারে দলগুলোর মধ্যে নানা বিষয়ে মতানৈক্য দেখা গেলেও ধর্মীয় বিষয়াদি সম্পর্কে তুরস্কের ইসলামপন্থীদের মধ্যে দ্বিমত কম। যুগপৎভাবে সরকারী ও বিরোধী দলে ইসলামপন্থীদের নানা মাত্রায় প্রভাব লক্ষ করা যায়।

- অর্থনৈতিক সফলতাকে শুরুত্বারোপ: গত এক দশক ধরে ৫ শতাংশ করে
  প্রবৃদ্ধি অর্জন করে আসছে তুরস্ক। সমকালীন বিশ্বমন্দা ইউরোপের
  বাজারকে স্তিমিত করে দিলেও তুরস্ক তার অর্থনীতিকে উন্নয়নের ধারায়
  ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। যদিও বর্তমান অনিশ্চিত পরিস্থিতি ও
  ভূরাজনৈতিক ইস্যুগুলোর কারণে তৃতীয় প্রান্তিকে এসে তারা জিডিপির পূর্ণ
  লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। ব্যাংক ঋণের লাগাম টেনে ধরার জন্য
  সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা আগের
  তুলনায় কিছুটা খারাপ। ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে সফল হলে তুরস্কের অর্থনীতি
  আরো গতি পারে বলে আশা করা যায়।
- জাতির সামনে বৃহত্তর লক্ষ্য হাজির করা: মান্যিকার্ট যুদ্ধের সহস্রাব্দ পূর্তি
  উপলক্ষ্যে ২০৭১ সালকে তুরস্কের লক্ষ্যমাত্রার বছর হিসেবে এরদোয়ান
  ইতোমধ্যে ঘোষণা করেছেন। যা তুরস্কের জনগণ বিশেষ করে তরুণ
  প্রজন্মকে বেশ উজ্জীবিত করেছে। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে
  তুরস্ক পররাম্রনীতিকে ঢেলে সাজিয়েছে। গাজা ইস্যুতে তুরস্কের ভূমিকা,
  আরবী ভাষাকে অন্যতম রাম্রীয় ভাষা হিসাবে চালু করার সংকল্প ঘোষণা,
  পাকিস্তানে সামরিক কর্তৃপক্ষ পরিচালিত স্কুলে তালিবান হামলায় নিহতদের
  স্মরণে রাম্রীয় শোক ঘোষণাসহ নানা ধরনের ত্বরিত ও সাহসী পদক্ষেপের
  মাধ্যমে তারা মুসলিম বিশ্বের শীর্ষ নেতৃত্ব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এগিয়ে যাছে।

ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রভাবে যখন ইসলামের সময়োচিত ব্যাখ্যা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল, সেই সময় উসমানীয় খেলাফতের রক্ষণশীল কার্যক্রম ইসলামী মূল্যবোধ ও ভাবাদর্শের গতিশীলতাকে ধারণ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে এক সময়ের প্রতাপশালী সামাজ্যের ভাঙ্গন শুরু হয়। মুসলিম বিশ্বের নেতা তথা খেলাফতের নিয়ন্ত্রক হিসেবে উসমানীয়দের বিভিন্ন অদূরদর্শিতার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে পুরো মুসলিম বিশ্বে। এক পর্যায়ে কামাল আতাতুর্কের মতো আধুনিকমনস্ক তুর্কি নেতৃত্ব প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান গ্রহণ করে স্বীয় ইসলামী ঐতিহ্যের বিরুদ্ধেই খড়গহস্ত হয়ে উঠেন।

ইসলাম চর্চার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সাঈদ নুরসীর মতো তাত্ত্বিক কর্মবীর পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে ইসলামের সার্বজনীন ব্যাখ্যা তুলে ধরতে সমর্থ হন। এ কারণে দীর্ঘ সময় ধরে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মহীনতার চর্চা হলেও তুর্কি সমাজ থেকে ইসলাম হারিয়ে যায়নি। বর্তমান তুরস্কের রাজনীতিতেও এর ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যাচছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, সেক্যুলারিজমের পথ ধরে ইসলামের সময়োপযোগী ব্যাখ্যাগুলো 'ইসলামী বহুত্বাদে'র মূর্ত প্রতীক হিসাবে ধীরে ধীরে সুধীসমাজ ও সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

একবিংশ শতাব্দীর শুরু হতে একেপির মতো ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল দলের ধারাবাহিক বিজয় বিশ্বের মুসলিম রাজনীতির জন্য একটা ভালো উদাহরণ হতে পারে। অবশ্য জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও এরবাকান সরকারের টিকে থাকতে না পারাটা একেপির জন্য সতর্কবার্তা। এরদোয়ানের মতো প্রাজ্ঞ নেতা বর্তমান তুরস্কের তরুণ প্রজন্মকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নই শুধু দেখাচ্ছেন না, একইসাথে ভবিষ্যতের দুনিয়াকে নেতৃত্ব দেয়ার লক্ষ্যে তুরস্ককে যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার কাজ ইতোমধ্যে শুরু করেছেন। নানা ধরনের সাহসী পদক্ষেপের ফলে বিশ্বগণমাধ্যম কর্তৃক এরদোয়ানকে 'নয়া খলিফা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

অর্থনীতির উন্নয়ন ও প্রবল জনসমর্থন নিয়ে সাহসী রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ ও দূরদর্শী পররাষ্ট্রনীতির সমস্বয়ে তুরস্ক এমন একটা অবস্থানে এসেছে, যার ফলে তারা মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী সমরতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। তুরস্ক মুসলিম বিশ্বের সেইসব দেশগুলোর অন্যতম যারা নিপীড়ক সেনাবাহিনী, চরম বিরূপ বিচার বিভাগসহ উল্লেখযোগ্য সব বিরোধী শক্তিকে সহনশীল মাত্রায় নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রায়োগিক কর্মনীতি অনুসরণের মাধ্যমে তারা 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব'কে এ পর্যন্ত অকার্যকর প্রমাণ করেছে।

তুরস্ক তার গৃহীত এসব পদক্ষেপ সফলতার সাথে বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে পারলে বিশ্ব রাজনীতিতে এক নতুন সমীকরণ তৈরি হবে। কৌশলগত কারণে তুরস্ক যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রের তালিকায় থাকলেও মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইলের পাশাপাশি শক্তিশালী কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের উত্থান পরাশক্তিগুলো কতটুকু সহ্য করবে সেটা অবশ্য দেখার বিষয়। সাবেক প্রতিপক্ষ রাশিয়ার সাথে তুরস্কের দৃশ্যমান সাম্প্রতিক বন্ধুত্ব কতদিন টিকে সেটাও দেখার বিষয়। এছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ নিয়ে জটিলতার অবসান এখনো শেষ হয়নি। এসব বৈদেশিক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও পরিপক্ক ও সময়োচিত নীতির কারণে তুরস্ক আজ এ পর্যন্ত আসতে সক্ষম হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে তুরস্ক নিশ্চয় তার কাঞ্চ্কিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।

## कासालवा(प्र व्रथस नार्ठ

### মাইদুল ইসলাম | অনুবাদ: আবিদুল ইসলাম চৌধুরী

গত শতাব্দীর বিশের দশকে মোন্তফা কামাল আতাতুর্ক তুরস্কে এমন একটি রাজনৈতিক ধারা প্রতিষ্ঠা করেন, যেটা পুরোপুরি ইউরোপীয় 'সেকুলার-জাতীয়তাবাদী' ধাঁচের। এটি ক্রমান্বয়ে 'কামালবাদ' নামে পরিচিতি পায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক দৃশ্যপট পরিবর্তনের সাথে সাথে মুসলিম বিশ্বেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সেখানে এমনসব শাসকের উত্থান ঘটে যারা জন্মগতভাবে মুসলিম হলেও বাস্তবে ছিল কামালবাদের অনুসারী। তাদের মনোভাব ছিল পশ্চিমা ধাঁচের এবং আধুনিকতাপন্থী। এসব শাসক বা নেতৃবৃন্দ কামালপন্থী হিসেবে পরিচিত। এই কামালপন্থী শাসকগণ রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ইসলামকে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় ও পরিত্যাজ্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতেন।

এমনকি উপনিবেশ পরবর্তী সময়েও অনেক মুসলিম দেশের শাসককে ইসলামের ব্যাপারে 'কামালবাদী' নীতির অনুসরণ করতে দেখা গেছে। তবে স্থানকালভেদে একেক দেশে একেকভাবে 'কামালবাদ' চর্চা করা হতো। মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে গ্রেষণা করতে গিয়ে ড. সালমান সায়িয়েদ মাটাদাগে

নিবন্ধটি কলকাতার প্রেসিডেসি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড, মাইদুল ইসলাম রচিত 'Limits of Islamism: Jamaat-e-Islami in Contemporary India and Bangladesh' শীর্ষক বইয়ের ভূমিকা থেকে অনূদিত।

Sayyid, *A Fundamental Fear*, p. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

<sup>° (</sup>অনু.) A Fundamental Fear বইয়ের লেখক।

'কামালবাদ' পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেছেন।<sup>8</sup>

এ ব্যাপারে সালমান সায়্যিদের সাথে আমিও একমত পোষণ করি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে শেখ মুজিবুর রহমান সেক্যুলার-জাতীয়তাবাদী মডেলের আলোকে যে ধারা তৈরি করেছিলেন, কামালবাদের সাথে এর মিল রয়েছে। মূলত কামালবাদেরই সুস্পষ্ট আরেকটি ধারা হচ্ছে বাংলাদেশের মুজিববাদ। এই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে মুজিববাদের মতাদর্শ ও রাজনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। তবে তার আগে 'কামালবাদ' পবিভাষাটি ব্যাখ্যা করা যাক।

কামালবাদ সম্পর্কে আর্নেস্টো লেকলৌ বলেছেন, "১৯৩০-এর দশকের শুরুর দিকে ছয়টি মূলনীতিকে তুর্কি প্রজাতন্ত্রে গ্রহণ করা হয়। কামাল পাশার রাজনৈতিক দল রিপাবলিকান পিপলস পার্টির লোগোতে অঙ্কিত ছয়টি তীর দ্বারা এই মূলনীতিগুলো বুঝানো হয়। এগুলো হলো: রিপাবলিকানিজম, ন্যাশনালিজম, পপুলিজম<sup>৫</sup>, রেভ্যুলোশনিজম, সেক্যুলারিজম এবং এটাটিজম (etatism)<sup>৬</sup>। এগুলোকে কামালবাদী আদর্শের স্তম্ভ গণ্য করা হয়। বিঅবশ্য লেকলৌর আগে সালমান সায়িদ্র কামালবাদের চারটি মূলনীতি চিহ্নিত করেন। এগুলো হলো: সেক্যুলারিজম, ন্যাশনালিজম, মডার্নাইজেশন এবং ওয়েস্টার্নাইজেশন। ৮

সমাজকে সেক্যুলার ও আধুনিকায়ন করার পাশাপাশি যুক্তির ভিত্তিতে সমাজ পরিচালনার চিন্তাকে প্রাধান্য দেয় কামালবাদ। এই চিন্তাধারা বাস্তবায়নে কামালবাদ কী পদক্ষেপ নিয়েছে তা নূর বেতুল চেলিক<sup>৯</sup> খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। <sup>১০</sup> তার মতে, মোস্তফা কামাল সমাজে পরিবর্তন আনা এবং সমাজকে আধুনিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> প্রাগুক্ত, পূ. ৫**৩**।

 <sup>(</sup>অনু.) একটি রাজনৈতিক মতবাদ, যেখানে অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থের বিপরীতে সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার কথা বলা হয়।

৬ (অনু.) অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে সমর্থনকারী বাদ।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ernesto Laclau, *On Populist Reason* (London: Verso, 2005), p. 208.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Sayyid, *A Fundamental Fear*, p. 63-79

<sup>&</sup>lt;sup>৯</sup> (অনু.) আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব কমিউনিকশনের মেম্বার ও গবেষক।

Nur Betül Çelik, 'The constitution and dissolution of the Kemalist imaginary', in David Howarth, Aletta J. Norval and Yannis Stavrakakis, eds. *Discourse Theory and Political Analysis: Identities, Hegemonies and Social Change* (Manchester: Manchester University Press, 2000), p. 195.

সর্বাগ্রে সেকুগুলারাইজেশনকে (রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে ধর্মের পৃথকীকরণ) গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। ১১ ইসলামের ব্যাপারে কামালবাদী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিকে 'Laicism' (তুর্কি ভাষায় সেকুগুলারিজমকে বলা হয় Layiklik) হিসেবে অভিহিত করা হয়। ১২ এর উদ্দেশ্য হলো জাতি ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করে ফেলা। ১০ মূলত ইসলামকে গণমানস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টাই ছিল কামালবাদী ডিসকোর্সের মূলভিত্তি। ১৪

যাহোক, কামালবাদী সরকারের সেক্যুলারাইজেশন প্রকল্প দুটি দিক থেকে ইউরোপীয়দের চেয়ে আলাদা। প্রথমটি হলো, তুর্কি সেক্যুলারিজম গড়ে উঠেছিল মূলত স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে। অর্থনৈতিক আধুনিকায়নের ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা, সেখানে তা হয়নি। দ্বিতীয় দিকটি হলো, সেক্যুলারিজমের কাঠামোটা ইউরোপ থেকে হুবহু নকল করে তুরক্ষের রাজনীতিতে প্রচলন করা হয়েছিল। স্ব

মনে রাখা দরকার, সরাসরি ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণে কিংবা ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও এনলাইটেনমেন্ট যুগের পটভূমির আলোকে তুরন্ধে সেকুলারিজম গড়ে উঠেনি। তবে বহু আগে থেকেই প্রাচ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে সেকুলারিজমের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রাচীন ভারতে নাস্তিক্যবাদী চার্বাক দর্শন থেকে শুরু করে সংশয়বাদ ও বস্তুবাদী লোকায়ত দর্শনের মতো অনেক সেকুলার দর্শন চর্চা করা হতো। স্বভাবতই এসব দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে মেনে নেয়া হয় না। এ ধরনের আরো অনেক অজ্ঞেয়বাদী দর্শনও সে সময় চর্চিত হতো। পাশাপাশি ঈশ্বরের অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ বৌদ্ধ ও জৈন নামের ধর্মীয় দর্শনও প্রাচীন ভারতে বিদ্যমান ছিল। এমব ছাড়াও পূর্ব-মীমাংসা, সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক–এর মতো প্রাচীন ভারতীয় দর্শনগুলোতেও নাস্তিকতাবাদের চর্চা হতো।

<sup>১৩</sup> প্রাগুক্ত।

Sayyid, *A Fundamental Fear*, p. 64

<sup>&</sup>lt;sup>১২</sup> প্রাগুক্ত।

<sup>&</sup>lt;sup>১৪</sup> প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৮।

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Bryan S. Truner, *Weber and Islam* (London: Routledge and Kegan Paul, 1974), p. 168.

Amartya Sen, *The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity* (London: Allen Lane, 2005), pp 16–25.

Debiprasad Chattopadhyaya, *Indian Atheism: A Marxist Analysis*, 1969. (New Delhi: People's Publishing House, 1980), p. 29.

তদুপরি প্রাচীন ভারতে সম্রাট আশোকের সময়টা ছিল ধর্মীয় সহিষ্ণুতার জন্য উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগে সম্রাট আকবরের শাসনামলে ভিন্ন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা আর ধর্মচর্চার অবাধ স্বাধীনতা ছিল। <sup>১৮</sup> এছাড়া মধ্যযুগে আবু বকর আল-রাজী, ইবনে রাওয়ান্দী এবং আল-ওয়ারাকীর মতো ধর্মের সমালোচনাকারী লোকেরও অভাব ছিল না। কোরআন, নবুয়ত ও নবী-রাসূলদের প্রচারিত ধর্ম সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ছিল সংশয়পূর্ণ। ১৯

সে সময়ের আরেক সমালোচক ও মুক্তচিন্তক আল-মায়ারীও একই ধারণা পোষণ করতেন। তাদের চিন্তাধারা ছিল সেক্যুলার ধাঁচের।<sup>২০</sup>

এসব দিক বিবেচনা করলে বলা যায়, প্রাচ্যে সেক্যুলারিজম চর্চার ইতিহাস বেশ পুরোনো। উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে প্রাচ্যের দেশগুলোতে পশ্চিমা সেক্যুলারিজমের অন্ধ অনুকরণ শুরু হয়। ফলে সংশ্লিষ্ট সমাজব্যবস্থা মতাদর্শিকভাবে পাশ্চাত্যের অধীন থেকে যায়।

ওয়েস্টফেলিয়ান সিস্টেমে<sup>২১</sup> জাতিরাষ্ট্রের যে ধারণা তৈরি হয়েছিল, কামালবাদ সেটাকেই একমাত্র বৈধ ও বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে করতো <sup>২২</sup> কামালবাদী আদর্শ

-

Sen, The Argumentative Indian, pp 17-18.

Paul E. Walker, 'The Political Implications of al-Rāzī's Philosophy', in Charles E. Butterworth, ed. *The Political Aspects of Islamic Philosophy: Essays in Honor of Muhsin S. Mahdi* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992), p. 68; Sarah Stroumsa, *Freethinkers of Medieval Islam: Ibn al-Rawāndī*, *Abū Bakr al-Rāzī and Their Impact on Islamic Thought* (Leiden: Brill, 1999); Edward Grant, *A History of Natural Philosophy: From the Ancient World to the Nineteenth Century* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), pp 84–87; Peter S. Groff, *Islamic Philosophy A–Z* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), pp 179–181; John L. Esposito, *The Oxford Dictionary of Islam* (Oxford: Oxford University Press, 2003), p. 263.

Reynold A. Nicholson, *A Literary History of the Arabs*, 1930. (London: Kegan Paul International, 1998), pp 316–324; Philip K. Hitti, *Islam: A Way of Life* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1970), pp 147–148.

<sup>&</sup>lt;sup>২১</sup> (অনু.) ১৬৪৮ সালে 'রোমান চার্চ', স্পেন সামাজ্য ও 'ডাচ প্রজাতন্ত্রের' মধ্যে জার্মানীর ওয়েস্টফেলিয়া শহরে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটি ছিল অনেকগুলো চুক্তির সমাহার (সিরিজ অব ট্রিটি)। তখন থেকে জাতিরাষ্ট্রভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে এবং জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া হয়।

<sup>&</sup>lt;sup>২২</sup> Sayyid, *A Fundamental Fear*, p. 65

জাতীয়তাবাদকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। পূর্বতন উসমানীয় খেলাফতের অধীনে বহু জাতিগোষ্ঠীর স্থিতিশীল সহাবস্থান ছিল। কিন্তু কামালবাদী শাসনামলে পদ্ধতিগতভাবে এমন একটি সমন্বিত চেতনা গড়ে তোলা হয়েছে, যা উসমানীয় খেলাফত ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করে কামালবাদের জাতিরাষ্ট্রের ধারণাকেই তুরক্ষের একমাত্র ইতিহাস হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করে। কারণ, কামালবাদ অনুসারে যে কোনো রাজনৈতিক জনগোষ্ঠীর জন্য জাতিরাষ্ট্রই একমাত্র উপযোগী ব্যবস্থা। ২০ এছাড়া কামালবাদের সাথে আধুনিকায়ন ও পাশ্চাত্যকরণ ধারণার তেমন পার্থক্য নেই। তাদের ভাবনায়, আধুনিক হওয়া মানে ইউরোপীয়দের অনুকরণ করা। ২৪

কামালবাদী কর্মসূচিতে প্রভাবিত হয়ে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য শাসকরাও নিজেদের দেশে এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া শুরু করে। ইরানে রেজা শাহ পাহলভি আধুনিকায়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন, যা 'পাহলভিস্ট ফ্র্যাটেজি' হিসেবে পরিচিত। <sup>২৫</sup> এছাড়া মিশরে জামাল আব্দুল নাসের, <sup>২৬</sup> আলজেরিয়ায় ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্টের (FIS) বিরোধী গ্রুপ<sup>২৭</sup> এবং ইরাকের বাথপন্থী শাসকগণ কামালবাদী আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। <sup>২৮</sup> কামালপন্থীদের মতে, কেউ যদি সত্যিকার অর্থে আধুনিক হতে চায়, তাকে অবশ্যই ইউরোপীয় সংস্কৃতি ধারণ করতে হবে। আর তা শুধু ধারণ করলেই চলবে না, বরং এই 'ইউরোপীয় মিরাকল' অনুকরণ, পুনরুৎপাদন ও ছড়িয়ে দিতে হবে। <sup>৩০</sup> ইউরোপীয় সংস্কৃতির ধারক এসব কামালবাদীদের এহেন পশ্চিমা অনুকরণ অন্ধ ভক্তির নামান্তর মাত্র। <sup>৩১</sup>

<sup>২৩</sup> প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৬, পৃষ্ঠা ৭৮।

<sup>&</sup>lt;sup>২৪</sup> প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৭।

<sup>&</sup>lt;sup>২৫</sup> প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৯-৭১।

<sup>&</sup>lt;sup>২৬</sup> প্রাঞ্জ ।

<sup>&</sup>lt;sup>২৭</sup> প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭২।

<sup>&</sup>lt;sup>২৮</sup> প্রাগুক্ত।

<sup>&</sup>lt;sup>২৯</sup> (অনু.) রেনেসাঁ, শিল্পবিপ্লব ও উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে ইউরোপের উত্থানকে এরিক জোন্স 'ইউরোপিয়ান মিরাকল' হিসেবে উল্লেখ করেন। এ সম্পর্কিত তার বইটির নাম 'দ্যা ইউরোপিয়ান মিরাকল'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালে।

<sup>ం</sup> Sayyid, *A Fundamental Fear*, p. 68

ত জ্যাঁক ল্যাকার মনোবিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে 'mimicry' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দেখুন *The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis*, ed. Jacques-Alain Miller and trans. Alan Sheridan (Harmondsworth, Eng:

উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে পশ্চিমের অনুকরণ ছিল কামালবাদীদের এক ধরনের বিকৃতি। এ জাতীয় অনুকরণের ফলে কামালবাদ তার লক্ষ্য অর্জনে পশ্চিমের মতো পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। কামালবাদীদের এসব কর্মকাণ্ডের ফলে 'পাশ্চাত্য' (Western) আর 'পাশ্চাত্যকরণ' (Westernized)-এর মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয়। অথচ এক সময় এ দুটো একই ব্যাপার ছিল। কামালবাদীরা 'পাশ্চাত্যকরণ' শুরু করায় এই পার্থক্য সূচিত হয়। এই অন্ধ অনুকরণের ফলে কামালবাদীরা পাশ্চাত্যের মৌলিকত্ব ধরে রাখতে পারেনি, যদিও তারা পাশ্চাত্যের কিছু উপাদান ও বৈশিষ্ট্য আয়ত্ব করতে পেরেছিল। মুসলিম বিশ্ব থেকে ইউরোপীয় কলোনী মাস্টারদের আনুষ্ঠানিক বিদায়ের পর কামালবাদী শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়েছে বটে, তবে এটা ছিল পশ্চিমা উপনিবেশেরই অংশমাত্র। এটা সম্ভব হয়েছিল কামালবাদীদের ইউরোপের প্রতি মোহাবিষ্ট থাকার কারণে, যা শেষ পর্যন্ত পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্বকেই মেনে নেয়।

উপনিবেশ-উত্তর এই ধরনের শাসনব্যবস্থাগুলো ছিল প্রকৃতপক্ষে কলোনী মাস্টারবিহীন উপনিবেশবাদ। উপনিবেশ-উত্তর ব্যবস্থার আড়ালে কলোনী মাস্টাররা নিজেদের লুকিয়ে রাখতে পেরেছিল।<sup>৩২</sup>

উপনিবেশ-উত্তর মুসলিম বিশ্বের ইউরোপমুখীনতার একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে আমি কামালবাদকে দেখিয়েছি, যা ইউরো-আমেরিকান বিশ্বের অন্ধ অনুকরণ করে। তারা ছোট-বড় যে কোনো জাতিরাষ্ট্রের নানা সমস্যা সমাধানে পাশ্চাত্যের আদর্শিক ও উন্নয়নের প্যারাডাইমের শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নেয়। এসবের প্রেক্ষিতে বলা যায়, 'ইসলামিজম' জাতিরাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদ ও সেক্যুলারিজমের মতো ধারণাগুলোর সমালোচক। ইসলামপন্থীদের মতে, এসব মতাদর্শে পশ্চিমাদের রাজনৈতিক ও আদর্শিক জ্ঞানতত্ত্বের ছাপ ফুটে উঠে। এই জায়গা থেকে ইসলামিজম এবং জাতিরাষ্ট্র ধারণার মধ্যকার সংশয়পূর্ণ সম্পর্ককে তাত্ত্বিকভাবে বোঝাপড়ার অবকাশ রয়েছে।

\_

Penguin Books, 1979), p. 73, pp 98–99. এছাড়া উপনিবেশ-উত্তর তাত্ত্বিক Homi Bhabha ল্যাকার mimicry ধারণাটিকে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। দেখুন Homi Bhabha, *The Location of Culture* (London: Routledge, 1994), pp 86–90.

Ajit Chaudhury, Dipankar Das and Anjan Chakrabarti, *Margin of Margin:* Profile of an Unrepentant Postcolonial Collaborator (Calcutta: Anusthup, 2000), pp 2–3.

# আধুনিক তুরস্কে ইসলামের পুনরুজীবনকারী বদিউজ্জামান সাইদ নুরসী

### আবিদুল ইসলাম চৌধুরী

পূর্ব তুরক্ষের বিৎলিস প্রদেশের ছোট্ট গ্রাম নুরস। ১৮৭৭ সালের এক বসন্তে সেই নুরস গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বিদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী। পিতা মির্জা আর মা নুরীর চতুর্থ সন্তান সাঈদ নুরসীর পরিবারটি ছিল কুর্দি গোত্রভুক্ত। 'বিদিউজ্জামান' হলো তাঁর উপাধি।

ছোটবেলা থেকেই সাঈদ নুরসী ছিলেন স্বাধীনচেতা। দশ বছর বয়সে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শুরু হয়। অল্প বয়সেই ধর্মতত্ত্ব নিয়ে জ্ঞান অর্জন করেন তিনি। এ কারণে সুফী দর্শনে প্রভাবিত হলেও সুফী তরিকায় পুরোপরি যোগ দেননি। ছাত্র হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। কোনো বিষয় মুখন্ত করতে খুব বেশি সময় লাগত না। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করা সাঈদ ধর্মতত্ত্বের উপর অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। এ সংক্রোন্ত যে কোনো বিতর্কে তাঁর যুক্তিগুলো ছিল অখণ্ডনীয়। ওই সময়ের আলেম সমাজকে যা বেশ অবাক করেছিল। পরবর্তীতে তাঁকে 'বিদিউজ্জামান' উপাধি প্রদান করা হয়। এর অর্থ হলো যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

মারদিনে অবস্থানকালে নামিক কামালের তাত্ত্বিক লেখাগুলোর সাথে সাঈদ নুরসীর পরিচয় ঘটে। মূলত কামাল ছিলেন 'ইয়ং টার্কিশ মুভমেন্টের' অন্যতম নেতা। মানুষের অধিকার, মুক্তি ও স্বাধীনতার পক্ষে লেখা নামিক কামালের পুস্তকগুলো তরুণ সাঈদ নুরসীর মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৮৯২ সালের দিকে তিনি ইয়ং টার্কিশ মুভমেন্টে যোগ দেন। তখন থেকে তিনি রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে শুরু করেন।

উনিশ শতকের শেষদিকে ভ্যান প্রদেশের গভর্নর হাসান পাশার আমন্ত্রণে সেখানে যান নুরসী। এক বছর পর নতুন গভর্নর তাহির পাশার বাসভবনে বসবাস করতে শুরু করেন তিনি। এ সময় সেখানকার আর্কাইভ ও লাইব্রেরির বইপত্রগুলো অধ্যয়ন করতে থাকেন নুরসী। বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত— এসব বিষয়ের উপর জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন। সাথে সাথে উসমানীয় সামাজ্যের সরকারী ভাষার উপরও দক্ষতা লাভ করেন। ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে সাঈদ নুরসী পরিবর্তিত সময়ে সময়োপযোগী চিন্তার সাথে পরিচিত হন। বুঝতে পারেন, শুধুমাত্র সনাতন শিক্ষাব্যবস্থা দিয়ে মুসলিম জাতিকে এগিয়ে নেয়া যাবে না। তাই তুরক্ষের পূর্বাঞ্চলে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার চিন্তা করতে থাকেন যেখানে ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকবে। পরবর্তীতে তাঁর সেই চিন্তানুযায়ী ১৯১৩ সালে ভ্যান প্রদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। জেহরা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত এই প্রতিষ্ঠানটিতে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থা এ অঞ্চলে ইসলাম সম্পর্কে খুবই উচ্চতর দর্শনের সূত্রপাত ঘটায়।

১৯০৯ সালে Committee of Union Progress তথা CUP সরকার তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ আনে ও বিচারের মুখোমুখি করে। পরবর্তীতে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন এবং মুক্তি পান।

উসমানীয় সাম্রাজ্যের শেষদিকে শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের জন্য তিনি আন্দোলন শুরু করেন। সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদকে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের প্রস্তাব দেন। তাঁর প্রস্তাব ছিল, সনাতনী মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি সুফীবাদ ও আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় করে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিরোধী ছিলেন। অবশ্য পরবর্তীতে খেলাফতের বিপন্ন অবস্থা দেখে নিজেই যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। জ্ঞান অর্জনে তিনি যেমন তুখোড় ছাত্র, তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রেও ছিলেন প্রচণ্ড সাহসী সৈনিক। ছাত্রদের নিয়ে গঠন করেন আধাসামরিক বাহিনী। তুরক্ষের পূর্বদিকে পাসিলোনা ফ্রন্টে রাশিয়ান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁর বাহিনী নিয়ে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে বন্দি হয়ে রাশিয়ান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নির্বাসিত হন। দুই বছর পর সেখান থেকে দেশে ফিরে আসতে সক্ষম হন। ১৯১৮ সালে ইস্তাম্বুলে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। সে সময় ইস্তাম্বুলের বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন 'দারুল হিকমাহ আল ইসলামিয়ার সদস্য হিসেবে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৯২২ সালের ৯ নভেম্বর গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলিতে (জিএনএ) বিদউজ্জামান নুরসীকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনন্দন জানানো হয়। উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হলেও ইসলামের প্রতি অনেক সংসদ সদস্যের উদাসীন মনোভাব দেখে তিনি হতাশ হন।

যুদ্ধের সময় নুরসী 'The Six Steps' শিরোনামে একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। নুরসীর এই লেখায় তুর্কি সৈনিকদের মনোবল চাঙ্গা হয়। স্বীকৃতি স্বরূপ কামাল পাশা তাঁকে আঙ্কারায় আমন্ত্রণ জানান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু নুরসীর ধর্মীয় প্রভাবে নয়া তুর্কি প্রজাতন্ত্রে কামালবাদী সেকুলার আদর্শ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। ফলে নুরসীকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখতে কামাল পাশা তাঁকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তিনি ছিলেন মুসলিম জনগণের ধর্মীয় চেতনাকে জাের করে মুছে ফেলে সেকুলারিজম চাপিয়ে দেয়ার বিরোধী। ফলে আদর্শের প্রতি দৃঢ় ও প্রজ্ঞাবান নুরসী বিনীতভাবে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মূলত তখন থেকেই কামাল পাশা সাথে তাঁর আদর্শিক সংঘাত শুরু হয়। সরকার সর্বক্ষেত্রে ইসলাম ও কােরআন নিম্বিদ্ধ করে দেয়ার প্রেক্ষিতে তিনি ঘােষণা করেন, "আমি দুনিয়ার কাছে প্রমাণ করবা যে কােরআন নিঃশেষ হয়ে যাবার মতাে কিছু নয়। এটি এক শাশ্বত জীবনব্যবস্থা, অফুরন্ত আলাের উৎস।" অবশ্য তারপের নিজেকে তিনি রাজনীতি থেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করেন।

১৯২৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি শেখ সাঈদ নামে এক নকশবন্দি শেখের নেতৃত্বে বিদ্রোহ শুরু হলো। এটি 'শেখ সাঈদ বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। মূলত কুর্দিদের স্বাধীনতা বা স্বায়ত্বশাসনের জন্য অনেক আগে থেকেই একটা গুঞ্জন ছিল। তবে তা খুব বেশি বড় আকারে ছিল না। বিদিউজ্জামান নুরসীর কাছ থেকে বিদ্রোহী নেতা শেখ সাঈদ সমর্থন লাভের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তিনি বরং এই বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছিলেন। অন্যদিকে, তুরস্ক সরকার এই ছোট্ট ঘটনাকে ইস্যু করে ১৯২৫ সালের ৪ মার্চ একটা আইন পাশ করে। আগে থেকেই নুরসীকে আটক করার সুযোগ খুঁজছিল নয়া স্বৈর-সরকার। এই আইনের মাধ্যমে ডাইরেক্টরি ক্ষমতা প্রয়োগ করে অনেকের সাথে নুরসীকেও কারাবন্দি করে ইস্তাম্বুল পাঠানো হয়।

১৯২৬ সালের দিকে ইস্পার্তায় নির্বাসনে পাঠানো হয় বদিউজ্জামান নুরসীকে। তিনি যেখানেই যেতেন সেখানকার মানুষ তাঁর ভক্ত হয়ে যেতো এবং তাঁর ছাত্রে পরিণত হতো। এ কারণে তাঁকে আরো দুর্গম এলাকা 'বারলায়' নির্বাসন দেয়া হয়। কিন্তু এখানে তাঁর ছাত্র সংখ্যা আরো বেডে যায়।

এই বারলাতেই তিনি বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'রিসালায়ে নুর' রচনার দুই-তৃতীয়াংশ কাজ সম্পন্ন করেন। তাফসীরটির রচনা সম্পূর্ণ হলে তাঁর ছাত্ররা নিজ হাতে লিখে এর অসংখ্য কপি তৈরি করে। আরবীর পাশাপাশি স্থানীয় ভাষায়ও এর অনুবাদ করা হয়। তারপর 'নুরস পোস্টাল সিস্টেম'-এর মাধ্যমে পুরো তুরক্ষে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

তুরস্ক জুড়ে রিসালায়ে নুরের প্রভাব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এতে কর্তৃবাদী সেকুগলার স্বৈর-সরকার বুঝতে পারে যে নুরসীর আন্দোলনকে তারা থামিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এ জন্য তাঁর উপর নতুন করে চাপ সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়। তাঁর কাজে তারা অ্যাচিত হস্তক্ষেপ করতে থাকে। এবার শুধু বাক-স্বাধীনতাই নয়, তাঁর চলাফেরার উপরও বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়।

রিসালায়ে নুর গ্রন্থের যুক্তিগুলো জনে জনে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ইতোমধ্যে সাঈদ নুরসী শুধু একজন আলেমই নন, সমাজ সংস্কারক হিসেবেও পরিচিত হয়ে উঠেন। সরকারের নানামুখী বাধার ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা আরো বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে আবারো অসংখ্য ছাত্রসহ তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। একই সাথে রিসালায়ে নুর নিষিদ্ধ করা হয়। এর যত কপি যেখানে পাওয়া গেছে, সবগুলো জব্দ করা হয়। এসবের ফলে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বাড়তে থাকে। সুযোগ পেলেই এর বহিঃপ্রকাশ ঘটতো। নুরসীকে যেখানেই নেয়া হতো, সেখানেই জনতার ভীড জমে যেতো।

গ্রেফতারকৃত সবার বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধি ১৬৩ ধারা অর্থাৎ সেক্যুলারিজমের মূলনীতি লংঘনের অভিযোগ আনা হয়। তারপর তাঁদেরকে ইসকিশেহির কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। কারাগারে বিদিউজ্জামান নুরসীকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখা হয়, যাতে তিনি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পরেন। এছাড়া জেলকোড অনুযায়ী কারাগারে তাঁদের প্রাপ্য ন্যূনতম সুবিধাও প্রদান করা হতো না। তাদের মধ্যে কয়েকজন শরীরিক নির্যাতনে মারাও যান।

পরবর্তীতে আদালতে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও শুধু পোশাক সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদে কোরআনের আয়াত ব্যবহারের অযুহাতে নুসরীকে ১১ মাস এবং তাঁর ছাত্রদেরকে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। তিনি আদালতের সামনে দৃঢ়ভাবে তাঁর উপর আরোপিত অভিযোগের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করেন। এতে বিচারকগণ সর্বোচ্চ শান্তির পরিবর্তে কারাদণ্ডের রায় প্রদান করতে বাধ্য হন।

কারামুক্তির পরও তিনি ও তাঁর ছাত্রদের উপর নজরদারী রাখা হয়। চল্লিশের দশকের শুরুর দিকে রিসালায়ে নুর তাফসীরটি অধ্যয়ন এবং প্রচারের অভিযোগে অসংখ্য সাধারণ মানুষ গ্রেফতার ও নির্যাতনের শিকার হয়। কাস্তামনু শহরে নুরসীর বাসায় নজরদারী ও বার বার তল্পাশি চালানো হয়। এক পর্যায়ে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। কিন্তু এতেও রিসালায়ে নুরের জনপ্রিয়তা ও ভক্তদের দমন করা যায়নি। তাই তাঁকে আবারো গ্রেফতার করা হয় এবং দেনজেলি কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ইসকিশেহির কারাগারের চেয়ে এই কারাগার ছিল আরো ভয়ানক।

এখানে খাবারে বিষ মিশিয়ে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় প্রশাসন। তবে বিষক্রিয়ায় তিনি শারীরিকভাবে আগের চেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েন।

১৯৪৪ সালের ২২ এপ্রিল রিসালায়ে নুরের বিষয়বস্তু খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি আঙ্কারা ফৌজদারী আদালতে সর্বসম্মত রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে বলা হয়— রিসালায়ে নুরের বিষয়বস্তুর ৯০ শতাংশই হলো ঈমানের সত্যতা ও এর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্পর্কিত গবেষণামূলক ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থটিতে গবেষণা ও ধর্মীয় মূলনীতি থেকে বিচ্যুত কোনো কথা নেই। ধর্মকে স্বার্থ হাসিলের জন্য ব্যবহার এবং কোনো সমিতি বা দল গঠন অথবা জনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করার মতো আন্দোলন গড়ে তোলার কোনো আলামত এ গ্রন্থে পাওয়া যায়নি।

তারপর ১৯৪৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর আপিল বিভাগের চূড়ান্ত রায়ে সকল বন্দিকে মুক্তি প্রদান করা হয়। সাথে সাথে বেড়ে যায় রিসালায়ে নুরের প্রচার ও প্রসার। তুর্কি জনগণের কাছে গ্রন্থটি নতুন করে আবেদন সৃষ্টি করে। দেশব্যাপী সাধারণ মানুষ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অনেকের ইতিবাচক মনোভাব তৈরিতে রিসালায়ে নুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

'Fifth Ray' বা 'পঞ্চম আলোকরশ্মি' শিরোনামের এক প্রবন্ধে হাদীসের ব্যাখ্যায় শেষ জামানায় দাজ্জালের আগমন সম্পর্কিত আলোচনায় নুরসী দাজ্জাল বলতে কামাল আতাতুর্ককে বুঝিয়েছেন— এমন অভিযোগে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করে আফিয়ান কারাগারে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু আফিয়ান কোর্ট কর্তৃক প্রদন্ত ২০ মাসের কারাদণ্ড উচ্চ আদালত খারিজ করে পুনর্বিচারের নির্দেশ দেয়। কিন্তু বিচারকাজ ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করা হয় এবং পুরো ২০ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। ফলে বিনা বিচারে তিনি ২০ মাসের দণ্ড ভোগ করতে বাধ্য হন। অবশ্য কারাবাসের মধ্যেও তাঁর অধ্যয়ন চলতে থাকে এবং সেখানেও তাঁর ছাত্র তৈরি হয়ে যায়।

১৯৫০ সালের সাধারণ নির্বাচনে কামালবাদী শাসনের পতন হলে পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন শুরু হয়। অবশেষে ১৯৫৬ সালের জুন মাসে রিসালায়ে নুরের উপর আদালত চূড়ান্ডভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে নুরসী ডেমোক্রেটদের প্রতি সমর্থন দেন। ৫০ সালের নির্বাচনেও তিনি কট্টরপন্থী সেকুলারদের (কামালবাদ) বিপরীতে ডেমোক্রেটিক পার্টিকে সমর্থন করেছিলেন। কারণ, ডেমোক্রেটরা ধর্ম ও মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে ছিল অনেকটা উদার। এ ব্যাপারে তাঁর ছাত্ররা প্রশ্ন করলে তিনি জবাব দেন, ডেমোক্রেটিক পার্টি পরাজিত হলে কট্টর সেকুলার এবং জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতা দখল করবে। ফলে সামাজিক ও জাতীয় জীবনে এক বড় বিপর্যয় নেমে আসবে। তারা যাতে ক্ষমতা দখল করতে না

পারে, তাই আমি আদনান মেন্দারিসকে অর্থাৎ ডেমোক্রেটিক পার্টিকে দেশ, ইসলাম ও কোরআন রক্ষার স্বার্থে সমর্থন দিয়েছি।

বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম নির্বাচনের সময় থেকেই বিদউজ্জামান নুরসী পুনরায় রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন। ৫৭ সালের নির্বাচনে পুনরায় ডেমোক্রেটরা জয়লাভ করে। কামালবাদী সেক্যুলার দল সিএইচপি নিজেদের বিপর্যয়ের জন্য নুরসীর আন্দোলনকে দায়ী করতে থাকে। ফলে কামালবাদী দলের সাথে নুরসী আন্দোলনের সমর্থক ও পাঠকদের দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। এই পরিস্থিতিতে নুরসী আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং বিজয়ী হন। ততদিনে তুরস্কে ধর্মচর্চার উপর নিষেধাজ্ঞা অনেকটা শিথিল করা হয়। তুরস্কের গণমানুষের কাছে বিদিউজ্জামান নুরসী অসম্ভব জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর এবং পরবর্তী বছরের জানুয়ারি মাসে ৮৩ বছরের বয়োবৃদ্ধ নুরসী একাধিকবার আঙ্কারা, ইস্তাম্বল ও কোনিয়া সফর করেন। রিসালায়ে নুর আন্দোলনের সর্বশেষ অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং রিসালায়ে নুর সেন্টার পরিদর্শন করতে তিনি এসব সফর করেন।

১৯৬০ সালের ২৩ মার্চ এই মহান আলেম ও সমাজ সংস্কারক উরফা প্রদেশে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে পুরো উরফার মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গভর্নরের চাপাচাপিতে পরদিনই তাঁকে দাফন করা হয় খলিলুর রহমান দরগার কবরস্থানে। বিদিউজ্জামান সাঈদ নুরসীর সমাধিস্থলে প্রতিদিন প্রচুর লোক জমায়েত হতো। ১৯৬০ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আবারো ধর্মীয় ও মৌলিক অধিকার সংকুচিত হয়ে পড়ে। জান্তা সরকার সাঈদ নুরসীর কবর স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। সামরিক প্রশাসন ১২ জুলাই রাতের আঁধারে জোরপূর্বক বিদিউজ্জামান নুরসীর দেহাবশেষ উরফা থেকে ইয়োরিদিতে স্থানান্তর করে। এখন পর্যন্ত ইয়োরিদির পাহাড়ঘেরা অজ্ঞাত স্থানে শায়িত আছেন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই মানুষটি।

## ফেব্ৰুল্লাহ গুলেন ও তাঁর আন্দোলন

## মাইমুল আহসান খান | অনুবাদ: ইব্রাহীম হোসেন

গত কয়েক দশক যাবং আধুনিক তুরক্ষে ফেতুল্লাহ গুলেন একজন পরিচিত ব্যক্তিত্ব। আমেরিকান ম্যাগাজিন 'ফরেন পলিসি' ও ব্রিটেনের জনপ্রিয় ম্যাগাজিন 'প্রসপেন্ট' কর্তৃক ২০০৮ সালে পরিচালিত সিটিজেন জরিপ অনুযায়ী তিনি বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি পূর্ব তুরক্ষের কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও ধর্মগুরুর কাছে ধর্মীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি আধুনিক সমাজ ও ভৌতবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছেন। ১৯৫৯ সালে কৃতিত্বের সাথে পরীক্ষায় পাশের পর তিনি সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ধর্মপ্রচারক হিসেবে আঙ্কারায় পেশাগত জীবন শুরু করেন। যদিও তাকে তৎকালীন ক্ষমতাসীন কট্টর সেকুলার সরকারের সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশনা মেনে চলতে হতো। তা সত্ত্বেও একজন মুসলিম ধর্মপ্রচারক ও সমাজবাদী হিসেবে তাঁর সকল আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রম, ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বক্তৃতাগুলোর মাধ্যমে তিনি দৃঢ় ভূমিকা রেখে চলেন। দেশের সকল রাজনৈতিক বিতর্ক থেকে নিজেকে দূরে রাখার সাথে সাথে গুলেন সবসময় গঠনমূলক সংস্কার, জনকল্যাণ এবং বিশ্বমঞ্চে তুরস্কের কৃতিত্ব তুলে ধরতে দেশবাসীকে আহ্বান করতেন। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তার অভিনব ধারণাসমূহ ইতোমধ্যেই বিভিন্ন সমাজে, বিশেষত মুসলিম সমাজে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি গতানুগতিকতা এবং সংকীর্ণতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন। স্বগোত্রীয় বা অন্য কারো দুর্দশার জন্য কোনো বিশেষ সরকারকে তিনি কখনো দায়ী করেননি। তিনি বরং নির্যাতিত ও উপেক্ষিত জনতার পক্ষে কথা

-

গুলেন মুভমেন্টের উপর ড, মাইমুল আহসান খান রচিত 'The Vision and Impact of Fethullah Gulen: A New Paradigm of Social Activism' শীর্ষক বইয়ের ভূমিকা থেকে অনুদিত।

বলেছেন, তাদের সাথে ধর্মীয় বক্তৃতা ও কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নতুন উদাহরণ খুঁজেছেন। সুনির্দিষ্ট কোনো সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি মনোনিবেশের পরিবর্তে তিনি রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক এলিটসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রতি সংস্কার কাজে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। সকল প্রকার সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি ও দলীয় রাজনীতি উপেক্ষা করে গুলেন নিরবচ্ছিন্নভাবে ঐক্য ও সংহতির আহ্বান করে যাচ্ছেন। ইসলামী ঐতিহ্যগত সুফীবাদ বা সুফী আন্দোলনে এটি নতুন কিছু নয়। গুলেন যে ধরনের আদর্শ প্রচার করেন তা অতীতের অনেক সুফী আন্দোলনগুলোর মতোই। এতদসত্ত্বেও, গুলেন প্রথাগত কোনো আধ্যাত্মিক গুরু কিংবা সুফী নন।

গুলেন ও তাঁর অনুসারীরা প্রবল সক্রিয়বাদিতা ও গভীর আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণে নতুন এক ধরনের ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিকতা ও পরার্থবাদিতা উপস্থাপন করেন, যা সমসাময়িক অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনে অনুপস্থিত। বিশ্বব্যাপী রাজনীতিনির্ভর ইসলামী আন্দোলনগুলোর ব্যর্থতা গুলেনের ধর্মপ্রচার বা লেখনীতে প্রতিফলিত হয়নি। অন্যান্য ধর্মীয় দলের পুনরুখান অথবা অনৈসলামী ধর্মীয় প্রথা কোনোভাবেই গুলেনের মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা বিস্তার, গণমুখী আধ্যাত্মিকতা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে নিরুৎসাহিত করেনি।

বিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক দশক থেকেই মানবজাতি তাদের রক্ষাকবচ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আদর্শের দিকে ব্যাপকহারে ঝুঁকে পড়েছে। এমতাবস্থায় গুলেন মনে করেন, যেহেতু প্রকৃত ইসলামী ধর্মীয় আদর্শ অনেকাংশে হারিয়ে গেছে নয়তো বিকৃত হয়েছে, সেহেতু ধর্মীয় মতবাদের প্রতি মানুষের নতুন এই ঝোঁক রাজনীতিতেও উগ্রপন্থার জন্ম দিয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোও এর থেকে ব্যতিক্রম নয়। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক খ্রিষ্টীয় মৌলবাদেরও সূচনা ঘটেছে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকগুলোতেই।

বিশ্ব মানচিত্রে মুসলিম জাতিরাষ্ট্রগুলোর উত্থানের সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের চরম ধর্মীয় অনুশাসনের উত্থান ঘটে, যা বিশ্বব্যাপী প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধের পুনর্জাগরণকে বাধাগ্রস্ত করে। গুলেনের ধর্মপ্রচার ও লেখনীতে দেখা যায়, কোরআনের শিক্ষা এবং ইসলামী ঐতিহ্যভিত্তিক নৈতিক মূল্যবোধ তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর অনেক পূর্বসুরীর বুদ্ধিবৃত্তিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন।

বিশ শতকের শুরুর দিকে জাতীয়তাবাদী আদর্শের উপর ভর করে বেশ কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র সমৃদ্ধি লাভের চেষ্টা করে। অনেক আরব ও পারস্য রাষ্ট্রের মতো তুর্কি প্রজাতন্ত্রের গোড়ার দিকে অনেক তুরস্কবাসীও জাতীয়তাবাদী আদর্শের উপর ভিত্তি করে একটি সমৃদ্ধশালী আধুনিক রাষ্ট্র গঠন করতে চায়। এর ফলে সকল ধরনের

ধর্মীয় ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের প্রতি তারা এক ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা ধরে রাখার রাজনীতিতে অনেক ধর্মীয় প্রতিনিধিত্বমূলক বিষয়সমূহকে নির্বিচারে অপব্যবহার বা আক্রমণ করা হয়। সমকালীন মুসলিম বিশ্বে অসহিষ্ণু শক্তিগুলোর মাঝে মতাদর্শিক লড়াই, বিশেষ করে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দৃশ্যমান চরমপন্থী মনোভাবের উপর গুলেনের মডারেট বক্তব্য ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছে। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে গুলেন সত্তা, সহমর্মিতা ও ধর্মীয় আচারের ক্ষেত্রে ভারসাম্যের নীতি প্রচার করেন।

গুলেনের সমসাময়িক বিশ্বের অন্যান্য দেশের ধর্মীয় নেতা বা ইমামদের মতো গুলেন কখনোই সেকুলার সরকার উৎখাত করে তদস্থলে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলকে বসানোর চেষ্টা করেননি। রাজনীতিতে বা রাষ্ট্রে দুর্নীতি নির্মূলের নিমিত্তে সরকার উৎখাতের ধারণাকে তিনি ভালো বিকল্প মনে করেননি। এ ধরনের ধারণাকে তিনি ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী মনে করেন। তাঁর মতে, কোনো সমাজ বা রাষ্ট্র এ ধরনের দলীয় রাজনীতির মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে পারে না। তাই গুলেন সবসময় তাঁর লেখনী ও বক্তব্যে নিবিড় শিক্ষা ও বিশ্বজনীন মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি শুদ্ধ সমাজ গঠনের আহ্বানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে সদাসতর্ক ছিলেন।

অনেক লেখক ও বিশ্লেষক গুলেনকে আধুনিক তুরস্কের 'রুমী' অভিহিত করেছেন। প্রসঙ্গত, রুমী তুরস্কের কোনিয়া শহরে সমাহিত আছেন। রুমী ছিলেন তের শতকের একজন বিখ্যাত কবি, দার্শনিক ও মরমী ব্যক্তিত্ব। তিনি তুর্কি ও ইরানীদের কাছে সমান জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ। তবে তাঁর জাতিগত পরিচয় নিয়ে দু'দেশের মধ্যেই মতানৈক্য রয়েছে। যাহোক, রুমীর সুফীবাদী ধারা জাতিগত ও গোত্রীয় দলাদলির একেবারে বিপরীত। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, আটশত বছর আগে মুসলিম সভ্যতায় কারো অবদান বিবেচনার ক্ষেত্রে জাতিগত ও গোত্রীয় পরিচয় খুবই তুচ্ছ বিবেচিত হতো।

বাস্তবে গুলেন মুসলমানদের এই মহৎ দৃষ্টিভঙ্গিটি আধুনিক তুরক্ষের লাখো মানুষের মনে ফিরিয়ে আনেন। প্রথাগত অর্থে গুলেন কবিও নন, মরমীও নন। সম্ভবত সুফীবাদের উপর তাঁর ধারাবাহিক লেখনী তাঁকে সুফী খেতাব এনে দিয়েছে। গুলেনের ধর্মপ্রচার সবার জন্য সহমর্মিতায় পূর্ণ। তাঁর লেখনী কারো বিরুদ্ধে হিংসার উদ্রেক করেনি। এসব কারণেই হয়তো গুলেনকে বাস্তবিকই একজন সুফী ভাবা হয়। তাঁর অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবন্যাপন ও খোদাভীরুতাও তাকে সুফী ভাবার দ্বিতীয় একটি কারণ।

হয়তো মুসলমানরা গুলেনকে তুরস্কের কিংবা মুসলিম বিশ্বের মহাত্মা বলে সম্বোধন করবে না, তবে পশ্চিমারা ইতোমধ্যে তাঁকে গান্ধী বলা শুরু করেছে। ধর্মপ্রচার ও লেখনীতে গুলেনের সুর অনেকটা রুমী ও গান্ধীর মতোই। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে শান্তি ও মানবতার পতাকাতলে একত্রিত করার ক্ষেত্রে তিনি সবসময় সত্যানুসন্ধান করেছেন। রুমীর মতো গান্ধীও কখনই তাঁর ধর্মীয় প্রথাকে পরিত্যাগ করেননি। অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অতিমাত্রায় সহনশীলতা প্রদর্শনের জন্য তাঁরা উভয়েই তাঁদের অনুরাগীদের কাছে অপছন্দনীয়, এমনকি নিন্দিত হয়েছিলেন। এক মৌলবাদী হিন্দু ১৯৪৮ সালে গান্ধীকে হত্যা করে। অন্যান্য গোঁড়া হিন্দু মৌলবাদীদের মতো তাঁর হত্যাকারীও বিশ্বাস করতো যে গান্ধী ব্রিটিশ আমলে ভারতের মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও দক্ষিণ আফ্রিকার সুফীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিন্দু ধর্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন।

তুরক্ষে ধর্মীয় ঘৃণা বিস্তারে উস্কানি দেয়ার অপবাদের যন্ত্রণা থেকে দূরে থাকতে গুলেন মার্কিন মুলুকে বসবাস করেন। সেখানে তিনি আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের লোকদের একত্রিত করার ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্ব লাভ করেন।

মুসলিম লেখকদের অনেকেই মনে করেন, বস্তুবাদী পশ্চিমা সমাজ কখনোই ইসলামের বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক বাণীগুলো গ্রহণ করবে না। ফলে তারা পশ্চিমাদের কাছে ইসলাম প্রচারের কাজকে বৃথা চেষ্টা বলে মনে করেন। গুলেন এ ধরনের সরলীকরণে বিশ্বাস করেন না। তিনি মনে করেন, পশ্চিমা বস্তুবাদ কখনো কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক একটি সহমর্মী সমাজ বিনির্মাণের পথে বাধা হতে পারে না। তিনি বিশ্বাস করেন ইসলামের মৌল উৎস থেকে উৎসারিত আধ্যাত্মিকতা অনুধাবন ও গ্রহণের ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের কোনো অন্তর্নিহিত সমস্যা নেই। প্রকৃত সাম্যভিত্তিক একটি বিশ্বসমাজ বিনির্মাণে মুসলমানরা পশ্চিমাদের আকৃষ্ট করতে কতটা ভালোভাবে ইসলামী আধ্যাত্মিকতা ও ইসলামের সার্বজনীনতাকে তুলে ধরতে পারে, সেটাই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

ধর্মীয় বিশ্বাসের উগ্র বহিঃপ্রকাশ ও জবরদন্তিমূলক প্রচারণার পরিবর্তে গুলেন গুরুত্ব দিতেন ব্যক্তির ভেতরের আধ্যাত্মিকতা, ইসলামের সহমর্মিতা ও গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর প্রচারের দিকে। আধ্যাত্মিকতার এ নতুন ধারা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্য, উত্তর বা দক্ষিণের কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি অতি গুরুত্ব দেয়ার বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন। তিনি সকল ধরনের জাতীয়তাবাদী গোত্রীয় সংঘাতমূলক কর্মপন্থার সমালোচনা করেছেন। যেসব নীতি মানুষে মানুষে বিভাজন, বৈষম্যমূলক ও পক্ষপাতমূলক আচরণের জন্ম দেয়, তিনি তার সমালোচনা করেছেন।

জাতি সম্পর্কিত ধারণায় তিনি বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাত করেননি। যে আনাতোলিয়া সবসময় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল, তা আজ এক ঐক্যবদ্ধ জাতি। সব ধরনের অন্ধ স্বদেশিকতামুক্ত হয়ে তিনি আনাতোলিয়াকে দেখেছেন 'মেসোপটেমিয়া, বলকান ও মধ্য এশিয়ার মানুষের মহাপরীক্ষা' হিসেবে। এই ধারণার পরিণতি হিসেবে তিনি মনে করেন, সমগ্র মানবজাতি আদম ও হাওয়ার ঔরসজাত। তিনি সকল ধর্মের, সকল মানুষের অন্তর্নিহিত ভালো গুণগুলো আমলে নেয়ার প্রতি গুরুত্ব দেন। তিনি মানুষের ভালো কাজের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। যেসব ফাঁকা বুলি মানুষকে হিংসা প্রচার করতে শেখায় ও মানুষের মাঝে ভীতি ছড়িয়ে দেয়, সেসব তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

গুলেন বিশ্বাস করেন, পৃথিবীর সকল মানুষেরই আধ্যাত্মিক মুক্তির প্রতি এক ধরনের আকৃতি রয়েছে। অন্যদের স্বর্গীয় গুণাবলি উপলব্ধির মাধ্যমেই এ নশ্বর পৃথিবীতে মানুষ কাজ্জিত আধ্যাত্মিকতা অর্জন করতে পারে। গুলেনের দৃষ্টিতে, বিশ্বজগত এবং পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব হচ্ছে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত একটি খোলা বই এবং কোরআন হচ্ছে মানবজাতির জন্য ওহীর ধারাবাহিকতার একটি সমুজ্জ্ল নিদর্শন।

গুলেনকে যারা পর্যবেক্ষণ করেন তারা গুলেনের লেখালেখি ও সরাসরি আলাপচারিতায় তাঁর মাঝে এ সকল ভাবনার প্রতিফলন দেখেন। তারা মনে করেন, গুলেন প্রকৃতপক্ষেই একজন সুফী। তারা এটাও মনে করতেন, গুলেনের এ ধরনের শান্তিপূর্ণ আহ্বান সেক্যুলার তুরক্ষের উগ্র তরুণ প্রজন্মের কাছে জনপ্রিয় হবে না। তবে তাদের এ ধরনের আশংকা বাস্তবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। দেখা গেছে, তাঁর অনুসারীদের অধিকাংশই তরুণ প্রজন্ম।

যদিও গুলেন ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে অত্যন্ত সক্রিয়, তবে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দল বা শক্তির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে তিনি অনিচ্ছুক। গুলেনের এই অরাজনৈতিক সন্তার কারণে তিনি তুরস্কের সকল শ্রেণীর মানুষের আশার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছেন। এ কারণে ভোটারদের আনুকূল্য পেতে সেক্যুলার রাজনৈতিক দলগুলো পর্যন্ত গুলেনের ধর্মপ্রচার ও যুক্তিশৈলী ব্যবহারের চেষ্টা করেছে। তৎসত্ত্বেও তিনি সারাজীবন সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে দরে থেকেছেন।

পশ্চিমাদের অনেকের চোখে গুলেনের জীবনধারা প্রাচ্য ভঙ্গীর সন্ন্যাসজীবন। এমনকি তারা তাঁকে নির্বাণের খোঁজে জীবন উৎসর্গীকৃত একজন মুসলিম দালাইলামাও মনে করে। যাহোক, মার্কিন মুলুকে তাঁর স্বেচ্ছা নির্বাসনে কখনোই তিনি মিডিয়াতে প্রচার বা জনপ্রিয়তার আকাজ্জী হননি। একজন প্রকৃত মুসলমান হিসেবে তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই ব্যাপৃত রেখেছেন আন্তঃধর্মীয় কার্যক্রম, জনহিতকর ও ইসলামী দায়িত্ব পালনে।

যেখানে গুলেনের সমসাময়িক অন্যান্য মুসলিম পণ্ডিতগণ নিজেদেরকে বিভিন্ন

মাজহাবী বিতর্কে জড়িয়েছেন; গুলেন সেখানে তাঁর লেখনী বা ধর্মপ্রচারে শিয়া-সুন্নী, হানাফী-হাম্বলী, মালিকী-শাফেয়ী— এসব মাজহাব ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করেননি। মাজহাবী বিতর্কে জড়িত পণ্ডিতগণ মনে করেন, মুসলিম জাতিকে শিরক ও বিদয়াত মুক্ত করতে ও মুহাম্মদ (সা.) প্রদর্শিত 'সীরাতুল মুস্তাকিম' বা সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থাকতে মাজহাবগত পার্থক্য খোঁজাই সঠিক পথ।

কিন্তু গুলেনের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার গুণাবলির সাথে মানবসন্তার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন। তাছাড়া মুসলিম সভ্যতার উদারতা ও বদান্যতার হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার আশা কেবল তখনই করা সম্ভব, যখন বিপুলসংখ্যক মানুষ নিঃস্বার্থভাবে গুধুমাত্র ইসলাম অনুমোদিত আধ্যাত্মিকতা অর্জনের জন্য এবং সমগ্র মানবতার কল্যাণ ও মর্যাদা সমুন্নত রাখতে নিজেদের উৎসর্গ করবে। গুলেন বিশ্বাস করেন, রাজনৈতিক বা সামরিক উপায়ে এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। যে কোনো বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে সকল পক্ষের সংলাপ ও কূটনীতি এ ক্ষেত্রে অধিকতর ভালো সমাধান। যারা মুনাফার লোভ ও অর্থ উপার্জনের জন্য প্রতারণার আশ্রয় নেন, তারা সমাজের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ। তাদেরকে মোকাবিলার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে কল্যাণমুখী শাসন ব্যবস্থা।

অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের মতো তুরস্ক কখনোই সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ছিল না। এ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে তুরস্কের পক্ষে ইসলামের সার্বজনীনতা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা সম্ভব হয়েছে। একই কারণে তারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপেও সমর্থ হয়েছে। আমেরিকা ও তুরস্কে বিভিন্ন আন্তঃধর্মীয় সংলাপ ও মুসলিম সমাবেশে প্রদত্ত গুলেনের ধর্মোপদেশও এ ধরনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আহ্বানে পরিপূর্ণ। গুলেনের লেখা অসংখ্য বইয়েও এ ধারণা সমুজ্জ্বল। সার্বজনীন মূল্যবোধ প্রচারের পাশাপাশি তুরস্কের জনগণের দুঃখ-দুর্দশার বিষয়েও গুলেন মনোযোগী। যদিও তিনি জানতেন তুরস্কের শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারে তাঁর অতি উৎসাহ কাছের লোকদের সাথে তাঁর দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারে, তবুও এ ব্যাপারে তিনি ক্ষান্ত হননি। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দল, উপদল বা গোষ্ঠীকে তাঁকে নিয়ে মাতামাতি করা বা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করার সুযোগ করে দেননি। তাঁর কৌশল খুবই পরিষ্কার। তাঁর সোজা কথা হলো, "মুসলমান হিসেবে যে কোনো ভালো কাজের সাথে আছি এবং যে কোনো খারাপ কাজকে বর্জন করবো।"

উগ্র সেকুগুলার শক্তি তাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের ক্ষেত্রে গুলেনকে ব্যবহারের চেষ্টায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তাদের একটি চেষ্টা ছিল গুলেনকে এমন একজন ধর্মীয় সংস্কারক হিসেবে চিহ্নিত করা, যার সংস্কার চেষ্টা রাসূলের (সা.) ধর্মপ্রচারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এতে ব্যর্থ হয়ে ইসলামবিরোধী কিছু শক্তি তুরক্ষের ভিতর ও বাইরে তাঁকে 'তুরক্ষের হবু খোমেনী' হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু খোমেনী যেমন বহু বছর তুরক্ষের বুসরা শহরে বাস করেও এবং তুরক্ষ ও ইরাকের সুন্নী সম্প্রদায়ের সাথে গভীর মেলামেশা করেও নিজেকে সুন্নী বানিয়ে ফেলেননি, তেমনি মার্কিন মুলুকে গুলেনের পরবাসী জীবনও গুলেনকে বিপ্লবী বা বস্তুবাদী ইসলামী ধর্মপ্রচারক করে তুলেনি।

গুলেনের দাড়িবিহীন চেহারা বা আধুনিক বেশভুষা তাঁকে কোনো অংশেই অনৈসলামী করে তোলেনি। তিনি কোনো ধর্মান্ধ গোড়াও নন, আবার এমন তথাকথিত আধুনিকও নন যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর গুণাবলি উপলব্ধি করতে অসমর্থ। কেউ যদি গুলেনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি আন্দোলনের সাথে খোমেনীর বিপ্লাবের তুলনা করে, তাহলে তা হবে এক ধরনের নির্বৃদ্ধিতা। কেননা এতে একদিকে গুলেনের সমাজ সংস্কার ও ইসলামী মূল্যবোধ পুনর্জাগরণের নানা রকম কার্যক্রমকে অম্বীকার করা হবে; অপরদিকে তুরস্ক ও ইরানের মধ্যকার অমিলগুলো সম্পর্কে অজ্ঞানতা প্রকাশ করা হবে।

গুলেন তাঁর লেখনী, ধর্মোপদেশ ও বক্তৃতায় সবসময় চেষ্টা করেছেন ভালোর বিকাশ ও মন্দের বিনাশ করতে। তিনি গঠনমূলক কাজ এবং এক ধরনের সক্রিয় আধ্যাত্মিক জিহাদ বেছে নিয়েছেন, যাতে করে তিনি লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা সাধনের ক্ষেত্রে মানুষের মনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারেন। তাঁর জিহাদের ডাকে রয়েছে সহমর্মিতা ও সুফীবাদী ভালোবাসার আহ্বান। এমনকি ধর্মীয় বাণী প্রচারের ক্ষেত্রেও নেই কোনো আগ্রাসী মনোভাব। যেমন তিনি বলেছেন:

"পরিবেশের প্রতি দায়বোধ, মানবতার প্রতি ভালোবাসা, সৃষ্টিজগৎকে সদ্মবহার করার সক্ষমতা— এগুলো আমাদের নিজেদেরকে বুঝতে পারা এবং সৃষ্টিকর্তার সাথে আমাদের সম্পর্ককে উপলব্ধি করার উপর নির্ভর করে। ... মানবতাবাদ হচ্ছে এমন একটি মতবাদ যা ভালোবাসা ও মানবতার কথা বলে। ইদানীং অবশ্য মানবতাবাদের যাচ্ছেতাই ব্যবহার হচ্ছে। নানা ধরনের ব্যাখ্যা দিয়ে এর সম্ভাবনাকে নিজের মতো করে কাজে লাগানো হচ্ছে। 'জিহাদ' নিয়ে বিভ্রান্ত ও সংশয়গ্রস্ত লোকেরা মানবতাবাদ সম্পর্কে যেসব ভাসাভাসা ও ভারসাম্যহীন ধারণা পোষণ করে— কোনো কোনো গোষ্ঠী সেসবই চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। ... জিহাদ আত্মরক্ষার উপায় হতে পারে কিংবা সৃষ্টিকর্তা ও মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার মাঝে যেসব বাধা রয়েছে সেসব দূর করার উপায় হতে পারে।"

অনেক বছর ধরেই পশ্চিমা ভাষ্যকাররা প্রশ্ন তুলছেন, কেন বিশ্বের খ্যাতিমান মুসলিম ও অমুসলিম লেখকগণ ইসলাম ও জিহাদ সম্পর্কিত জটিল বিষয়গুলোর কোনো সহজ ব্যাখ্যা দিতে পারছে না। এ ব্যাপারে গুলেনের উপরিউক্ত বক্তব্য খুবই স্পষ্ট ও সঙ্গতিপূর্ণ। বিভিন্ন ইসলামী বিষয় ও মানবতাবাদের সাথে তার আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যায়ও

তিনি স্পষ্ট ও সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থান নিয়েছেন। এভাবে গুলেন মুসলিম বিশ্ব ও পশ্চিমাদের মাঝে বিরাজমান বুদ্ধিবৃত্তিক শূন্যতা কিছুটা হলেও কমাতে সক্ষম হয়েছেন।

অপরদিকে, পশ্চিমাদের মানবাধিকার ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা অথবা চ্যালেঞ্জ করা তুলনামূলক সহজ কাজ। যাহোক, মানবাধিকার বা মানবতার ব্যাপারে ফাঁকা বুলি কোনো জাতি বা মানবগোষ্ঠীর জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে না। এক্ষেত্রে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী মূল্যবোধ প্রচারের কাজে নিয়োজিত রাজনৈতিক দল বা আন্দোলনের প্রবক্তাদের চেয়ে গুলেন আলাদা।

ইসলামী শাসনব্যবস্থার একটি সামগ্রিক মডেল হিসেবে গুলেন বিশেষ কোনো জাতিরাষ্ট্রকে উপস্থাপন করেননি। তার পরিবর্তে গুলেন মুভ্যমন্ট বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির মধ্যে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে পশ্চিমা ভোগবাদী সমাজের কাছে একটি পূর্ণাঙ্গ ভালো বিকল্প উপস্থাপন করার কঠিন কাজ গুরু করেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতুবন্ধনের ক্ষেত্রে গুলেনের শান্তিপূর্ণ কৌশল তুরক্ষের জনমানসে কী গভীর প্রভাব ফেলছে তা হয়তো গুলেন নিজেও ধারণা করতে সমর্থ্য নন।

সমগ্র মানবজাতির জন্য শান্তি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুলেনের বাস্তবসম্মত যুক্তি বুদ্ধিবৃত্তিকতা প্রসারে সত্যিই এক অনন্য উদাহরণ। গুলেন তাঁর সমস্ত লেখনীতে কোনো বিশেষ মতাদর্শে দীক্ষাদানের পরিবর্তে মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এর অংশ হিসেবেই তুরস্কের শিক্ষাবিদ ও ব্যবসায়ীদের সহায়তায় বিশ্ব জুড়ে শত শত স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেসব স্কুলে শিক্ষকরা মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার মহত্তম আদর্শগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন।

যেহেতু গুলেন মুভমেন্টের পুরোভাগে রয়েছে তুর্কি বংশোদ্ভূত সুন্নী মুসলিমরা, সেহেতু গুলেন আন্দোলনের তুর্কী ও সুন্নী বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো অনেক কিছু বলা যায়। কারো মনে এ প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয় যে তুরস্কের মতো চরম সেক্যুলার রাষ্ট্রে গুলেনের মতো একজন শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব হলো কী করে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, ইসলাম ও মানবতার প্রতি গুলেনের জীবনব্যাপী নিষ্ঠাই সম্ভবত তাঁর আবির্ভাবের কারণ। গুলেনের আদর্শে যারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন তারা কখনই ইসলামী মূল্যুবোধ, শিক্ষাব্যবস্থা বা সংস্কৃতি প্রচারের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের দলীয় সংকীর্ণতা বা অন্ধ জাতীয়তাবাদের দোষে দুষ্ট হননি। গুলেন মুভমেন্টের সফলতার মূল রহস্য এখানেই। এটাই তাঁকে একজন জীবন্ত কিংবদন্তীতে পরিণত করেছে। এজন্যই তিনি ২০০৮ সালের জরিপে সবচেয়ে প্রভাবশালী বৃদ্ধিজীবী বিরেচিত হয়েছেন।

# **थ**र्स ७ ग्राजनीजिंग सिञ्चन नित्रा ७ल्लान्त्र पृक्टि७ि

অনুবাদ: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

ধর্মের রাজনীতিকরণ সবসময়ই একটি নেতিবাচক প্রবণতা। এটি সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের আধ্যাত্মিক সম্পর্ককে এক ধরনের মতবাদ বিশেষে পর্যবসিত করে। এ সম্পর্কে গুলেন বলেন, "ধর্ম হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সম্পর্ক। ধর্মানুভূতি মানুষের অন্তরের গভীরে প্রোথিত থাকে। ... আপনি যদি এটিকে কোনো বিশেষ ব্যবস্থার আদলে দৃশ্যমান করার চেষ্টা করেন তাহলে একে ধ্বংস করলেন। ধর্মের রাজনীতিকরণ বিশেষ কোনো সরকারব্যবস্থার যতটা না ক্ষতি করে. তারচেয়ে বেশি ক্ষতি করে স্বয়ং ধর্মের।"

তিনি আরও বলেন, "ধর্ম মূলত মানবজীবন ও অস্তিত্বের চিরন্তন দিকসমূহের উপর আলোকপাত করে। অপরদিকে, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা মতবাদগুলো শুধ কতিপয় জাগতিক ও পরিবর্তনীয় দিকের সাথে সংশ্লিষ্ট।"

ধর্মের সাথে রাজনীতি না মেশানোর অর্থ এই নয় যে পাবলিক ক্ষিয়ার, রাজনীতি বা অর্থনৈতিক বৈষম্যের ব্যাপারে ধার্মিক ব্যক্তিরা বেখবর থাকবে। ধার্মিক বা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গের উচিত রাজনীতি থেকে দূরে থাকা বা রাজনীতিতে না জড়ানো— ফেতুল্লাহ গুলেন এ ধরনের কোনো দাবি করছেন না। এ ধরনের প্রস্তাবনা মূলত চুপ মেরে যাওয়ার (quietism) চেয়ে ভালো কিছ নয়। তা হবে নাগরিক দায়বদ্ধতা ও সামাজিক অংশগ্রহণের দিক থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়ার শামিল। রাজনীতিতে

religion] শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ থেকে এটি অনুদিত।

গুলেনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের 'What is Fethullah Gülen's view on mixing politics religion?' [http://en.fgulen.com/about-gulenmovement/3968-what-is-fethullah-gulens-view-on-mixing-politics-and-

সম্পৃক্ততার মানে পক্ষপাতিত্ব এবং দলীয় আনুগত্য নয়। মানবিক মর্যাদা ও কল্যাণ, পরিবেশ উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়নিষ্ঠা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে— এমনসব রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে ধর্মের বক্তব্য থাকতে পারে। বাস্তবে তা থাকা উচিতও বটে।

সত্যিকারের ধার্মিক ব্যক্তিদের মধ্যে যারা দায়িত্ববোধ সহকারে রাজনীতি করেন, তারা নিছক কোনো একক ইস্যুনির্ভর ভোটার অথবা দলবিশেষের অনুগত হতে পারেন না। বিভেদের পরিবর্তে তারা বিদ্যমান সম্প্রদায়সমূহ ও সমাজব্যবস্থাগুলোর মধ্যে ঐক্য গড়ার কাজে ব্রতী হন। ফেতুল্লাহ গুলেন ধর্মকে রাজনীতির অনেক উর্ধের্ব বিবেচনা করেন। তাঁর মতে, ধর্ম হলো নৈতিকতার উৎস। যা দায়িত্বশীল রাজনীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়, বরং সহায়ক। ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে তিনি কখনো ভাবেন না। ধর্মকে রাজনীতির সাথে গুলিয়ে ফেললে যে কোনো প্রকার নেতিবাচক রাজনীতির জন্য মানুষ ধর্মকেই দায়ী করতে পারে। কারো রাজনৈতিক উচ্চাকাঞ্জার কারণে ধর্ম সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হোক— এমনটি তিনি কখনো চান না।

## **७लान सूछलाने ७ रेप्रला**स

অনুবাদ: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

গুলেন মুভমেন্ট নামে পরিচিত ফেতুল্লাহ গুলেন পরিচালিত আন্দোলন বিশেষ কোনো আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ নয়। ইসলামকে রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে ব্যবহারে ফেতুল্লাহ গুলেনের ঘোরতর আপত্তি রয়েছে। সে দৃষ্টিতে গুলেন মুভমেন্টকে রাজনৈতিক ইসলামের সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করাটা মারাত্মক ভুল। তাঁর মতে, 'ইসলামপন্থা' একটা আন্তর্জাতিক ইস্যু হিসেবে উঠে আসার পেছনে ঔপনিবেশিকতার প্রভাব রয়েছে। এ দৃষ্টিতে প্রাচ্যবাদ তথা প্রিয়েন্টালিজম হচ্ছে উপনিবেশবাদের অন্যতম আদর্শিক-রাজনৈতিক ফল। প্রাচ্যবাদের টার্গেট শুধুমাত্র মুসলিম বিশ্বই নয়, উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশগুলোও বটে। প্রাচ্যবাদের দৃষ্টিকোণ হতে পাশ্চাত্য শিক্ষিত জগতের বাইরের তাবং সংস্কৃতি এবং সভ্যতাই হলো পশ্চাৎপদ, বর্বর ও প্রতিক্রিয়াশীল; যা তথাকথিত তৃতীয় বিশ্ব হিসেবে পরিচিত। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক, সামরিক এবং অর্থনৈতিক সম্প্রসারণবাদকে জায়গা করে দেয়ার মতো একটা সাংস্কৃতিক রূপান্তরের লক্ষ্য ছিল তথাকথিত প্রাচ্যবাদের মূল আদর্শ। অন্তর্গত দিক থেকে শোষণমূলক এবং ঔপনিবেশিক প্রাচ্যবাদের প্রেক্ষাপটে ইসলামী মতাদর্শ বা রাজনৈতিক ইসলামের উদ্ভব ঘটেছে। এই শোষণের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক পরিচয় হিসেবে ইসলাম প্রশ্ন হাজির হয়েছে।

বলাবাহুল্য, বর্তমান সময়কাল ও পরিস্থিতি ইতোপূর্বকার সনাতনী প্রাচ্যবাদ ও ইসলামপন্থার আবির্ভাবকালীন প্রেক্ষাপট থেকে অনেকটাই ভিন্ন। অর্থাৎ পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। সনাতনী প্রাচ্যবাদের যেসব ভিত্তি ছিল, সেগুলোর অনেক কিছুই বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিমগুলে তেমনভাবে আর নেই। এখন এটি অনেক বেশি মানবতাবাদ, নৈতিকতা এবং সার্বজনীন মূল্যবোধভিত্তিক। এই পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনগুলোকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে। এটি নিশ্চিত, এসব সত্ত্বেও

\_

<sup>&#</sup>x27;The Gülen Movement and Islam' (www.fb.com/notes/852948321911876/) শিরোনামের একটি আর্টিকেল থেকে এটি অনূদিত।

অনেক প্রান্তিক বা চরমপন্থী গোষ্ঠী রয়ে গেছে যারা রাজনৈতিক ও আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকেই সবকিছু বিবেচনা করে। এই গ্রুপগুলোর কোনো ভিশন নেই। মোটের উপর, তারা জাগতিক শক্তি, সাধারণ সমর্থন এবং আদর্শিক দিক থেকে অনেক বেশি দুর্বল। অতএব, বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের সকল কর্মকাণ্ডকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিছক রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে দেখা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেটাকে হুমকি বিবেচনা করা স্পষ্টতই ভুল। গুলেন মভমেন্ট সম্পর্কে এটা বিশেষভাবে সত্য।

উল্লেখ্য, এই আন্দোলনের মৌলিক ভিত্তির মধ্যে ধর্ম এবং বিশেষ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ছোঁয়া থাকলেও তা সব ধরনের রাজনৈতিক বা মতাদর্শিক বেড়াজাল হতে মুক্ত। গুলেন সারাজীবন রাজনীতিতে জড়িত হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলেছেন। তিনি কখনো রাজনৈতিক কোনো বিষয়ে কিছু বলেননি বা করেননি। কখনো একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে ইসলামকে উপস্থাপন করেননি। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত হননি। তাঁর বিবেচনায় এই ধরনের মনোভাব ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা। স্বীয় চিন্তাধারাকে তিনি বিভিন্ন বক্তৃতা এবং বইয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। [সূত্র: M. Fethullah Gülen, The Statue of Our Souls, NJ: The Light, Inc., 2005, p. 122, 145, 159]

গুলেন মুভমেন্ট সম্পর্কে একটি সাধারণ ভুল ধারণা হলো একে নিছক একটি ধর্মীয় আন্দোলন মনে করা। গুলেন মুভমেন্টকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে আমাদেরকে সামাজিক আন্দোলনের প্রচলিত বিশ্লেষণী ধারার চেয়েও গভীরে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, গুলেন মৃভমেন্ট কোনোভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন নয়। এই আন্দোলন পরিচালনা করছেন তুর্কি সমাজের বাছাইকৃত কিছু মানুষ। নিঃস্বার্থ, আত্মনিবেদিত এই ব্যক্তিরা মূলত শহুরে নাগরিক। তারা উচ্চশিক্ষিত, আধুনিক ও সমকালীন মূল্যবোধে গভীরভাবে বিশ্বাসী। যেহেতু তারা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক আদর্শ দ্বারা উদ্বন্ধ নন সে কারণে তারা বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় আদর্শের ব্যাপারেও তেমন কোনো নেতিবাঁচক মানসিকতা পোষণ করেন না। চরমপন্থী অথবা প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনসমূহের ক্ষেত্রে যেমনটি দেখা যায়, গুলেনপন্থীরা তেমন কোনো বিক্ষুব্ধ চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ নন। তারা বরং মতৈক্য, সংলাপ এবং সহনশীলতার সম্পর্কে বিশ্বাস করেন। তাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সম্পর্কসমূহ কেবলমাত্র ইতিবাচক কর্মকাণ্ডেই প্রোথিত। তারা সামাজিক ইস্যুগুলোকে উত্তম বিকল্প দিয়ে রূপান্তর করতে চান। এই কাজ করতে গিয়ে তারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করেন ना. এমনকি শক্তি প্রয়োগ করে সেগুলোকে ধ্বংস বা পরিবর্তন করতেও চান না। অথবা প্রচলিত ব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলতেও আগ্রহী নন। তারা বরং প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কগুলোর আওতাকে ইতিবাচক অর্থে সম্প্রসারিত করতে চান। এক কথায়, গুলেন মুভমেন্টের সাধারণ লক্ষ্য হলো ব্যক্তি, সমাজ এবং মানবতার সেবা করা।

# (फ्यूब्राश ७८लान ७ प्राञ्ज नूराप्रीरा सर्पा नार्थका

রজব তাইয়েব এরদোয়ান | অনুবাদ: মুমিনুল ইসলাম চৌধুরী

#### প্রিয় ভাইয়েরা!

আমি আপনাদেরকে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বলবো। মরহুম বিদিউজ্জামান সাঈদ নুরসী কেন ডেমোক্রেট পার্টির আদনান মেন্দারিসকে সমর্থন করেছিলেন, তাঁর ছাত্ররা তাঁকে এ কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। তাঁর জবাবটি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন: "ডেমোক্রেট পার্টি পরাজিত হলে কট্টর সেকুলার এবং জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতা দখল করবে। ফলে সামাজিক ও জাতীয় জীবনে এক বড় বিপর্যয় নেমে আসবে। সুতরাং, তারা যাতে ক্ষমতা দখল করতে না পারে, তাই আমি আদনান মেন্দারিসকে অর্থাৎ ডেমোক্রেটকে দেশ, ইসলাম ও কোরআন রক্ষার স্বার্থে সমর্থন দিয়েছি।"

সাঈদ নুরসী সিএইচপির অবর্ণনীয় নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন। তাঁকে বারবার নির্বাসন দেয়া হয়েছিল, কারাগার থেকে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল, নির্যাতনের উপর নির্যাতন করা হয়েছিল। এমনকি তাঁকে বিষপানে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। সিএইচপির সাথে তিনি বিন্দুমাত্রও আপস করেননি। দেশ থেকে পালিয়ে অন্য দেশে গিয়ে নিজ দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা নস্যাৎ করার চিন্তাও তিনি করেননি। তিনি চাইলে বারলা থেকে পালিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু যাননি। বরং উল্টো রাশিয়া থেকে পালিয়ে সাইবেরিয়া হয়ে দেশের মাটিতে ফিরে এসেছিলেন। তিনি বলেছেন, যদি আমার জায়গা কারাগারের অন্ধ কুঠুরিতেও হয়, তবুও তো এটা আমার জন্মভূমি। তিনি আরো বলেছেন, নিশ্যুই

এটি ২০১৪ সালের ২ মার্চ তুরস্কের স্পারতা নগরীতে এক নির্বাচনী সমাবেশে এরদোয়ানের দেয়া বক্তৃতার পরিমার্জিত অনুবাদ। ইউটিউব লিংক: https://youtu.be/LTzTWx1sOJQ

জালিমদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। তাঁর এই কথাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

এখন পেনসিলভেনিয়ার সেই ব্যক্তিটি যিনি জীবনে কোনোদিন 'বদিউজ্জামান' উপাধিটা পর্যন্ত মুখে আনেননি; অথচ দাবি করেন, তিনি বদিউজ্জামানের পথেই হাঁটছেন। কিন্তু এটা তো সত্য নয়। সিএইচপির সাথে হাতে মিলিয়ে একত্রে আন্দোলন করে কেলেঙ্কারীর রাজনীতি করা একজন মানুষ কীভাবে সাঈদ নুরসীর পথের পথিক হতে পারেন! এটা কি সম্ভব? তিনি ১২ সেপ্টেম্বরের অভ্যুত্থানকারীদের সাথে কাজ করছেন। শুধু তাই নয়, তাদের অভিনন্দনপত্রও পাঠিয়েছিলেন। আর খ্রিষ্টান পাদ্রীদের সাথে অতিরিক্ত মাখামাথি সম্পর্কেও আপনারা বেশ ভালোভাবেই জানেন।

আমরা রাজনীতিবিদ, তাই সবার সাথেই আমাদের মিশতে হয়। কিন্তু তিনি তো রাজনীতিবিদ নন। জিজ্ঞাসা করলে তো তিনি নিজেকে একজন আলেমে দ্বীন হিসেবে পরিচয় দেন। তার কাজকর্ম কোখেকে পরিচালিত হয়— সেটাও তো মানুষের কাছে পরিষ্কার নয়। ২৮ ফেব্রুয়ারির অভ্যুত্থানকারীদের তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। ১৭ ডিসেম্বর সিএইচপির সাথে কাজ করা ব্যক্তি কীভাবে মরহুম সাঈদ নুরসীর পথের অনুসারী হতে পারে?

আমি এখনো বলছি, বছর দুয়েক আগেও তাঁকে বলেছি, আপনি আমেরিকা ছেড়ে তুরস্কে আসুন। কিন্তু তিনি আসেননি। আমি আবারও বলছি, আপনি আন্তরিক ও সৎ হয়ে থাকলে দেশের অভ্যন্তরীণ কাজে অযাচিত হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। তুরস্ক যদি আপনার দেশ হয়ে থাকে, তাহলে এখানে ফিরে আসুন।

<sup>১</sup> ফেতুল্লাহ গুলেনকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। গুলেন বর্তমানে তুরস্ক ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ায় বসবাস করেন।

ই ১৯৮০ সালের ১২ সেপ্টেম্বর সেনাবাহিনী অভ্যুত্থান করে, যা প্রজাতান্ত্রিক তুরক্ষের ইতিহাসে তৃতীয় সেনা অভ্যুত্থান হিসেবে পরিচিত। এই অভ্যুত্থানের পর দেশের সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হয়। তারপর সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় মাদারল্যান্ড পার্টি ক্ষমতায় আসে। এই অভ্যুত্থানের সাথে সম্পৃক্ত তৎকালীন সেনাপ্রধানসহ অন্যান্যদের বর্তমানে বিচার চলছে।

<sup>°</sup> ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি থেকে তুর্কি সেনাবাহিনী সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র শুরু করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সেনাবাহিনীর জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৎকালীন ইসলামপন্থী প্রধানমন্ত্রী এরবাকানকে এই সিদ্ধান্তে সম্মতি দিয়ে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়। ফলে ওয়েলফেয়ার পার্টির এই নেতার পক্ষে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। এই অভিনব ঘটনা তুরস্কের ইতিহাসে 'উত্তরাধুনিক যুগের সামরিক কুয়' হিসেবে বিবেচিত।

### হিজমতের<sup>8</sup> কর্মী ভাইয়েরা!

আমি জানি, আপনাদের মধ্যে আন্তরিক ও পরিচ্ছন্ন মানসিকতার অনেকেই রয়েছেন। আপনারা বছরের পর বছর অর্থ-সম্পদ দান করছেন, শ্রম দিয়েছেন, যানবাহন ও জায়গা-সম্পত্তি প্রদান করেছেন। আপনাদের অনেকে তাদেরকে স্কুল ও ছাত্রাবাস তৈরি করে দিয়েছেন। বিশ্বাস করুন, আমিও হিজমতের ব্যাপারে আন্তরিক ও ইতিবাচক ছিলাম। আমি তাদেরকে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতাও করেছি। তিনি নিয়মিত যেসব চিঠিপত্র ও বই আমাকে পাঠাতেন সেগুলো এতটাই আবেগঘন ছিল যে আমি ভেবেছিলাম তিনি সত্যিই আন্তরিক। তিনি আমাকে তসবি পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন। কেবল আনারসটাই

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত তুর্কি অলিম্পিয়াডে রাস্লের (সা.) উপস্থিতির কথা শুনে আমি খুবই অবাক হয়েছি। এটা কেমন কথা? এমনটা কখনো আশা করিনি। এ ব্যাপারে অনেক আলেমের সাথে কথা বলেছি। সবাই খুব অবাক হয়েছেন এবং ব্যাপারটা সরাসরি আকীদার সাথে সম্পর্কিত বলে তাঁরা মতামত দিয়েছেন।

#### প্রিয় ভাইয়েরা!

এই তারাই তো তাদের টিভি চ্যানেলে প্রিয়নবী মুহাম্মদকে (সা.) মেরাজ থেকে নামিয়ে এনে লরিতে উঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। তারা কীভাবে এমন অনৈসলামিক ও আকীদাবিরুদ্ধ কথা বলতে পারেন? আসলে তারা নির্লজ্জ, মিথ্যা কথা বলা তাদের অভ্যাস। তাদের সাথে যুক্ত ভাইদের আমি বলতে চাই, দয়া করে বিবেক দিয়ে চিন্তা করুন।

মরহম সাঈদ নুরসী ও পেনসিলভেনিয়ার বসবাসরত এই ব্যক্তির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে। একজন দেশ, জাতি ও পুরো উম্মাহর কল্যাণের জন্য কারাগারের প্রকোষ্ট বেছে নিয়েছিলেন। আর অন্যজন দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে কাজ

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ফেতুল্লাহ গুলেনের আন্দোলন তুরস্কে 'হিজমত' নামে পরিচিত।

<sup>&</sup>lt;sup>৫</sup> ফেতুল্লাহ গুলেনের ফাঁস হয়ে যাওয়া ফোনালাপে ব্যবহৃত সাংকেতিক শব্দ। এরদোয়ান ঠাট্টাচ্ছলে প্রসঙ্গটি এখানে উল্লেখ করেছেন।

৬ বিশ্বজুড়ে গুলেন মুভমেন্ট কর্তৃক পরিচালিত স্কুলগুলোর বার্ষিক অনুষ্ঠান।

<sup>&</sup>lt;sup>৭</sup> গুলেন এক সময় নুরসীর ছাত্র ছিলেন। গুলেনের সমর্থকরা তাঁকে সাঈদ নুরসীর উত্তরাধিকারী হিসেবে দাবি করে। আর বিরোধীরা তাঁকে সাঈদ নুরসীর পথ থেকে বিচ্যুত বলে অভিহিত করে।

করছেন, দেশের শৃঙ্খলা বিনষ্ট করছেন। 'স্বয়ং জিব্রাইল (আ.) দল গঠন করলেও আমার পক্ষে তা সমর্থন করা সম্ভব হবে না'— এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাও তিনি বলেছেন। ১৯৯৫ সালে এক টিভি সাক্ষাৎকারে তিনি এই কথা বলেছিলেন। অবশ্য বর্তমানে তিনি ব্যাপারটা অস্বীকার করতে চান। ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে চান, তিনি আসলে এটা বলেননি, অন্য কিছু বোঝাতে চেয়েছেন। আমরা টিভিতে তাঁর এ বক্তব্য দেখিনি? আপনারা কি দেখেননি? একজন আলেম, সর্বোপরি একজন মুসলমানের মুখে কি এমন অভিশাপমূলক কথাবার্তা মানায়?

#### প্রিয় ভাইয়েরা!

আমরা গযবের জন্য আসিনি, রহমতের জন্য এসেছি। আমরা এভাবেই এতটা পথ পেরিয়ে এসেছি। কারণ, আমরা রাসূলের (সা.) উম্মত। আমরা তাঁরই অনুসারী। আমরা গযব চাই না, আমরা রহমতের মুখাপেক্ষী। এর জন্যই আমরা কাজ করি। এর জন্যই আমাদের সকল প্রচেষ্টা।

এখন পেনসিলভানিয়ার সেই ব্যক্তি এই নির্বাচনে সিএইচপিকে সমর্থন করেছেন এবং সকল শক্তি দিয়ে সাহায্য করছেন। এই তিনিই বলেছিলেন, তাঁর অরাজনৈতিক অবস্থানের কারণে তিনি খোদ জিব্রাইলকেও (আ.) সমর্থন করবেন না। অথচ এখন তিনি সিএইচপির মতো দলকে সমর্থন করছেন!

# মেকুজনার তুরস্কে ইমলামপন্খীদের অভিড্ততার বয়ান

## আবিদুল ইসলাম চৌধুরী

'For the people, despite the people' শ্লোগান নিয়ে শুরু হওয়া মোস্তফা কামাল পাশার আধুনিকীকরণের অগ্রযাত্রা বেশ প্রভাব ফেলে তুরক্ষের শহুরে অঞ্চলের মানুষের উপর। ইউরোপীয় আধুনিকতার আদলে তুরস্ককে গড়ে তোলার জন্য সেকুগলারিজমের আবরণে তিনি নজিরবিহীনভাবে ধর্মহীনতাকে চাপিয়ে দেন। এই প্রক্রিয়াটি পরবর্তীতে 'কামালবাদ' নামে পরিচিতি লাভ করে। কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দেশটিতে একদলীয় শাসন চলতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মেরুকরণ শুরু হলে তুরস্কও তা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারেনি। তুরস্কের তৎকালীন ডেমোক্রেট সরকার পশ্চিমাদের রাজনৈতিক বলয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র চর্চা শুরু হয়। ন্যাটোর সদস্যপদ গ্রহণ করা হয়। সে সময় তুরস্কের ইসলামী চিন্তাবিদগণ ধর্মহীন সমাজতান্ত্রিকতার বিপরীতে সরকারের নেয়া পদক্ষেপগুলোতে সমর্থন দান করেন। পরবর্তী ইসলামপন্থী দলগুলোও আদর্শিক কারণে কমিউনিস্টবিরোধী অবস্থানে অটল থাকে। অপরদিকে বামপন্থী রাজনীতিতে কুর্দিরা বেশ জোরালো অবস্থান গ্রহণ করে। আর সমাজের এলিট ও সেক্যুলার ধারাকে জোরালো সমর্থন দিতে থাকে কামাল আতাতুর্কের আদর্শবাহী সেনাবাহিনী। যারা সেক্যুলারিজমের ব্যানারে ধর্মহীনতাকে টিকিয়ে রাখতে চারটি নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতা থেকে অপসারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেছে।

স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তুরস্কের জাতীয় পরিচয়ের সংকট তীব্র হয়ে উঠে। রাজনৈতিক মেরুকরণ জাতিকে বিভক্ত করে ফেলে। 'হয় তুর্কি নয়তো কুর্দি, হয় ইসলামপন্থী নয়তো সেক্যুলার'— অবস্থা যখন এ পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়, তখন তুরস্কের ধর্মীয় মূল্যবোধের জায়গাগুলোতেও পক্ষ-বিপক্ষের আওয়াজ ওঠে। সেনাবাহিনীর চাপে কোয়ালিশন সরকারগুলোর অবস্থাও হয়ে পড়ে নড়বড়ে। পাশাপাশি কুর্দি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে সরকারকে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকতে হয় পুরো দশক জুড়ে। ফলে অর্থনীতিতে বিরাজ করতে থাকে টালমাটাল অবস্থা। এসবের মাঝেও দিন দিন ইসলামপন্থীরা রাজনীতিতে শক্তিশালী অবস্থান করে নিতে সক্ষম হয়।

১৯৯৭ সালে এরবাকান সরকারকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা হলেও তুরস্কের মূলধারার রাজনীতিতে ইসলামপন্থীরা ধারাবাহিকভাবে তাদের অবস্থান দৃঢ় করে তোলে। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে উদার ইসলামপন্থী দল একেপিকে তুরক্ষের জনগণ এককভাবে নির্বাচিত করে। উদারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কারণে দলটির জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়তে থাকে। পরবর্তী সব নির্বাচনে জয়লাভ করে দলটি। যা দেশটির বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত।

#### তিন প্রভাবককে নিয়ন্ত্রণ

একেপি সরকার টিকে থাকার ফলে তুর্কি সমাজ তো বটেই, রাজনীতিতেও ইসলাম ক্রমে বেশ গুরুত্ব পাচ্ছে। তুলনামূলক উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও অর্থনৈতিক সাফল্য থাকা সত্ত্বেও ইসলামপ্রীতির কারণে একেপি সরকারকে নানা সময় বেশ কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। তবে বেশ দৃঢ়তার সাথে একেপির প্রাজ্ঞ নেতারা তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন। এক্ষেত্রে তুরস্কের সেনাবাহিনী, বিচার বিভাগ ও অর্থনীতি— এই তিনটি প্রভাবক গুরুত্বের সাথে বিবেচ্য।

### এক, সেনাবাহিনী

কামালবাদী মূলনীতির ধারক তুরস্কের সেনাবাহিনী অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। ১৯৬০ সালে ডেমোক্রেট ও ৭১ সালে সুলেমান ডেমিরেলের নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতা থেকে অপসারণে এই বাহিনী সরাসরি নেতৃত্ব দেয়। শুধু তাই নয়, ৮০ ও ৯৭ সালে আরো দুটো নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করে সেনাবাহিনী। ২০০২ সালে একেপি ক্ষমতায় এসে সেনাবাহিনীর ব্যাপারে সতর্ক অবস্থান নেয়। শুরু থেকেই নিজেদের সেকুলার ও গণতান্ত্রিক হিসেবে দাবি করা একেপি ক্ষমতায় এসে গণতান্ত্রিক সংস্কারের পদক্ষেপ নেয়। আর এতে তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সদস্যপদ লাভের বিষয়টিকে কাজে লাগায়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সদস্যপদ লাভের বিষয়টিকে কাজে লাগায়। ইউরোপীয় ইউনিয়নে সদস্যপদের জন্য সঙ্গত কারণেই 'কোপেনহেগেন ক্রাইটেরিয়া'র শর্ত পূরণ আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। ক্রাইটেরিয়াতে বলা হয়েছিল, রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ রাখতে হবে। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ বেসামরিক ব্যক্তির নেতৃত্বাধীন হতে হবে এবং বছরে ছয়বারের বেশি বৈঠকে মিলিত হতে পারবে না। তাছাড়া প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল ব্যয় 'কোর্টস অব অ্যাকাউন্টসের' নজরদারিতে রাখতে হবে।

ইইউর সদস্যপদ অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত এসব পদক্ষেপের কারণে গণতন্ত্র ভাবাপন্ন ব্যবসায়ী, উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী ও কর্মতৎপর মধ্যবিত্ত সমাজের সমর্থন একেপি সরকারের দিকে ঝুঁকতে থাকে। এছাড়া বিষয়টিকে একেপি সরকার কামাল আতাতুর্কের আধুনিক তুরস্ক গড়ার স্বপ্নের সাথে একই সূত্রে গাঁথা হিসেবে তুলে ধরে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ অর্জন করতে পারলে তুরস্কের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব আরো বাড়বে বলে মত দেন তৎকালীন সেনাপ্রধান হোসেইন কিভরিকোগলু। এ জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কট্টর সেকুলার ও প্রধান বিরোধী দলের ব্যাপক বিরোধিতা সত্ত্বেও ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনের পক্ষে জনগণ রায় দেয়। যথারীতি একেপি সরকার 'কোপেনহেগেন ক্রাইটেরিয়া' অনুসারে সংবিধান সংশোধন করে নেয়। এর ফলে প্রায় ৮৭ বছর ধরে দাপিয়ে বেড়ানো সেনাবহিনীর মুখে লাগাম পরাতে সক্ষম হয় কৌশলী একেপি সরকার।

### দুই. বিচার বিভাগ

তুরক্ষের বিচার বিভাগের সবচেয়ে প্রভাবশালী অঙ্গটি হলো 'সাংবিধানিক আদালত'। ১৯৬১ সালে গঠিত এই সাংবিধানিক আদালতকে ৮২ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে আরো ক্ষমতাশালী করা হয়। সেকুলারিজমের সাথে সংঘর্ষিক যে কোনো রকম কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ ও রদ করতে সুপ্রিম কোর্টের এই প্রভাবশালী অঙ্গটি পুলিশিংয়ের কাজ করে থাকে। বিভিন্ন সময় ইসলামপন্থী রাজনীতিক ও দলগুলোকে নিষিদ্ধ করেছে এই সাংবিধানিক আদালত। এছাড়া ৯৭ সালে এরবাকান সরকারকেও ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করায় ভূমিকা ছিলো এই আদালতের।

হেডক্ষার্ফ ইস্যুতে ২০০৮ সালে ক্ষমতাসীন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এরদোয়ানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তবে সৌভাগ্যক্রমে বিচারক ট্রায়ালে মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে তখন টিকে গিয়েছিলেন তিনি। এছাড়া সাংবিধানিক আদালত কুর্দিদের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলটিকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে তুরক্ষের সাংবিধানিক আদালতের কর্মকাণ্ড অনেকটা অগণতান্ত্রিক বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। কারণ, মানুষের ব্যক্তিগত মতামত ও সংস্কৃতির উপরও নাক গলাতে দেখা গেছে এই সাংবিধানিক আদালতকে। ইইউর সদস্যপদ পেতে যে শর্ত দেয়া হয়েছিল সেখানে সুপ্রিমকোর্ট ও সাংবিধানিক আদালতের বিচারক নিয়োগে প্রেসিডেন্টের এখতিয়ার ও ভূমিকা বাডানোর কথা উল্লেখ ছিল।

২০১০ সালের গণভোটের রায় অনুযায়ী কিছুটা হলেও এখতিয়ার সরকারের অনুকূলে আসে। সে অনুসারে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি আইন পাশের মাধ্যমে বিচার বিভাগের জ্যেষ্ঠ সদস্যদের নিয়োগের দায়িত্বে থাকা 'হায়ার কাউন্সিল অব জাজেজ অ্যান্ড প্রসিকিউটরস' (HSYK)-এর নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে এসেছে। তবে এপ্রিল মাসে এই আইনের কিছু অংশ বাতিল করে দেয় সাংবিধানিক আদালত, যেখানে নিয়াগের ক্ষেত্রে বিচারমন্ত্রীকেও কিছুটা ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল।

#### তিন, অর্থনীতি

সেনাবাহিনীর অ্যাচিত হস্তক্ষেপ, অস্থিতিশীল গণতন্ত্র, কুর্দি আন্দোলনসহ নানা কারণে এক সময় ভঙ্গুর অর্থনীতি ও বেকারত্বের দেশ ছিল তুরস্ক। বিভিন্ন সময় তুরস্কের অর্থনীতি বিপর্যয়ের মুখে পড়লেও ২০০০-০১ সালের দিকে তা চরম আকার ধারণ করে। এসব বিপর্যয় সত্ত্বেও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী তুরস্ক গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০০২ সালে ক্ষমতায় আসে একেপি। ২০০২ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বছরে ৭.৫ শতাংশ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয় দেশটি। মুদ্রাক্ষীতি নিয়ন্ত্রণ ও সুদের নিম্মুখী হারের কারণে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও ক্রয়ক্ষমতা আগের তুলনায় বেড়েছে। সাথে সাথে অর্থনীতিতে বেসরকারীকরণের ব্যাপ্তিকে সময়োপযোগী করে গড়ে তোলার কারণে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগও (FDI) বেড়ে যায়। অর্থনীতিকে আরো গতিশীল ও জনকল্যাণমুখী করতে একেপির পদক্ষেপগুলো সফলতার মুখ দেখতে শুরু করে। ফলে দেখা যায়, ২০০৮ সালে যেখানে গড়ে মাথাপিছু আয় ছিল ২ হাজার ৮'শ মার্কিন ডলার, ২০১১ সালে তা ১০ হাজার ডলার ছুঁয়ে যায়। যেটা সে সময় তুলনামূলকভাবে ইইউভুক্ত বেশ কয়েকটি দেশকে পর্যন্ত ছাড়িয়ে যায়। এসব সফলতার কারণে জনগণ ধীরে ধীরে নিজেদের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাগুলো অনুভব করতে থাকে।

২০০২ সালে জনকল্যাণে খরচ করা হয়েছিল জিডিপির ০.৫%, যা ২০১৩ সালে গিয়ে দাঁড়ায় ১.৫%। এসব খরচের সুবিধাভোগীদের মধ্যে নারীদের হার ছিল ৬০ শতাংশ। প্রায় ৩ মিলিয়ন পরিবার সরাসরি সাহায্য পায়। যার বেশিরভাগ ছিল গ্রামাঞ্চলের লোকজন। দেখা যায়, ২০০২ সালে দৈনিক ৪ ডলারের নিচে আয় করা লোকের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ। আর ২০১২ সালে সেই সব লোকের হার চলে আসে ৩ শতাংশের নিচে। ফলে লোকজনের ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যায়, বেড়ে যায় চাহিদা ও উৎপাদনের পরিমাণ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে বাণিজ্যিক প্রবেশাধিকারের চুক্তি, তুর্কি লিরার মূল্য পুনর্নিধারণ, সুদের নিম্নমুখী হার ও বৈদেশিক বিনিয়োগের কারণে কর্মসংস্থানের বিশাল ক্ষেত্র তৈরি হয়। তুরক্ষের অর্থনীতি যে আগের চেয়ে অনেক বেশি স্থিতিশীল অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেছে, তা সাম্প্রতিক সময়ের আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনগুলোতেও স্বীকার করা হয়েছে। এই অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাই একেপি সরকারের সগৌরবে টিকে থাকার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকগণ। বিরোধীপক্ষের দুর্নীতির অভিযোগ সত্ত্বেও সর্বশেষ নির্বাচনে একেপির প্রাপ্ত ভোটের হার অতীতের রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে যায়।

#### আন্তর্জাতিক রাজনীতি

অতীতের সরকারগুলোর মতো এরদোয়ান সরকারও পশ্চিমা শক্তির সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। ঐতিহাসিকভাবে তুরক্ষের সাথে যুক্তরাষ্ট্র ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে এসেছে। উভয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, জ্বালানী নিরাপত্তা বৃদ্ধি, পরমাণু অস্ত্রবিস্তার রোধ, মুক্তবাজার অর্থনীতি, উদার গণতন্ত্রের বিস্তার ইত্যাদি ইস্যুতে একসাথে কাজ করে আসছে। পূর্ব ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব ধরে রাখতে যুক্তরাষ্ট্র এখনো তুরক্ষের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বিশেষ করে মুসলিম সদস্য রাষ্ট্র তুরক্ষের সেনাবাহিনী ন্যাটোতে দ্বিতীয় বৃহত্তম। কৃষ্ণসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ও 'বাকু-তিবিলিসিসাইহান' পাইপলাইনের নিরাপত্তায় তুরক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান অংশীদার। ইরানের উপর অবরোধ আরোপে বিরোধিতা, ইসরাইলের আগ্রাসী নীতির কঠোর সমালোচনা ও হামাসের প্রতি অনুকূল নীতি গ্রহণ সত্ত্বেও ওয়াশিংটন একেপির উপর আস্থা রেখেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ISIL দমনে তুরস্ক কৌশলী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সিরিয়ায় কুর্দি নিয়ন্ত্রিত কোবানি শহরটি ISIL-এর দখলে চলে যাওয়ার পর তুরস্ক যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এ ব্যাপারে একসাথে কাজ করতে সম্মত হয়। কারণ, কোবানি শহরটি তুরস্কের সীমান্তে অবস্থান করায় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ইস্যুতে আন্ধারা আরো কঠোর হয়ে ওঠে। তবে এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ISIL দমনে যুক্তরাষ্ট্র কুর্দি যোদ্ধাদের নিকট অস্ত্রশন্ত্র পাঠানো শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের তৎপরতা তুরস্কের বিচ্ছিন্নতাবাদী কুর্দিদের সাথে চলমান শান্তি আলোচনাকে প্রভাবিত করবে বলে দাবি করে তুরস্ক। কুর্দিদের হাতে অস্ত্র চলে গেলে তা এ অঞ্চলের অস্থিতিশীল পরিস্থিতিকে আরো দীর্ঘায়িত করবে। অন্যদিকে, ISIL-এর মতো উগ্রপন্থীদের উত্থানের ফলে একেপির 'ইসলাম এজেন্ডা'র বাস্তবায়নও অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিকভাবে নেতিবাচক পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার আশংকা থাকে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে 'zero problems with neighbors' নীতি মধ্যপ্রাচ্যে তুরস্কের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের আকাজ্ফাকে তুলে ধরে। তবে সিরিয়ার ক্ষমতা থেকে আসাদ সরকারকে সরানোর ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তুরস্ক নীতিগতভাবে একমত। অন্যদিকে, ২০০৩ সাল থেকেই ইরাকের অভ্যন্তরে অভিযান পরিচালনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে তুরস্কের ভূমি ব্যবহারে অসহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে একেপি সরকার।

কোপেনহেগেন ক্রাইটেরিয়া অনুসারে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের ফলে ইইউর কাছে একেপি সরকারের গ্রহণযোগ্যতা আগের সরকারগুলোর তুলনায় বেশি। যদিও হেডস্কার্ফ এবং উসমানীয় আমলে সংঘটিত আর্মেনিয়ার গণহত্যা ইস্যুতে ২০১১ সালের ডিসেম্বরে ফ্রান্সের সাথে তুরক্ষের সম্পর্কে কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আর্মেনিয়ার গণহত্যা ইস্যুটিকে ইইউর সদস্যপদ অর্জনে অন্যতম বাধা হিসেবে

বিবেচনা করছেন বিশ্লেষকগণ। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে গুলেন ইস্যুতে পশ্চিমা মিডিয়াগুলোতে একেপি সরকারের কঠোর সমালোচনা শুরু হয়। যদিও গুলেনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী গ্রুপকে পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ করেছে সরকার।

অতীতের তিক্ততা এড়িয়ে আঞ্চলিক দেশগুলোর সাথে সম্পর্কোন্নয়ন, দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ নিরসনে মধ্যস্থতা ও বৈশ্বিক পরিসরে নেতৃস্থানীয়, সৌহার্দ্যপূর্ণ ও জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তিকে মূল লক্ষ্য রেখে বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন, বিরোধী বিক্ষোভকারীদের সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কারণে আন্তর্জাতিক মহলে এরদোয়ান প্রশংসিত হয়েছেন।

### আদর্শিক ডিলেমা

সত্তরের দশকের শুরুর দিকে তুরক্ষের ইসলামপন্থীরা শুরু করে 'মিল্লি গুরুশ' আন্দোলন। সেকুলারাইজেশন এবং পাশ্চাত্যকরণের ফলে তুরক্ষে যেসব সামাজিক সমস্যা তৈরি হয়েছিল, সেগুলো দূর করতে আন্দোলনটি সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ, শিল্পায়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং নৈতিক উন্নতির কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই আন্দোলনের অগ্রপথিক ছিলেন এরবাকান। তাঁর উপর একাধিকবার রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। এমনকি তাঁর হাতে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোকেও একের পর এক নিষিদ্ধ করা হয়। তুর্কি সমাজে ইসলামের যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে কামালবাদী সেকুলার আদর্শের প্রভাব বলয়ে ইসলামের অনুকূলে যে কোনো চিন্তা বা পদক্ষেপ বাধাগ্রন্থ হয়েছে সবসময়।

সর্বশেষ ফজিলেত পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার পর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশলগত ইস্যুতে ইসলামপন্থীদের মধ্যে বিভক্তি দেখা দেয়। ফলে একটি ধারা রয়ে যায় রক্ষণশীল ইসলামপন্থী হিসেবে। আর অন্য ধারাটি গড়ে উঠে তুলনামূলক উদারবাদী ইসলামপন্থীদের নিয়ে। শেষোক্তদের নিয়ে এরদোয়ান ও আব্দুল্লাহ গুল প্রতিষ্ঠা করেন জাস্টিস অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট পার্টি বা একেপি। বিগত সময়ে নিষিদ্ধ হওয়া সচরাচর ইসলামী দলগুলো থেকে তুলনামূলক উদারমনা জনগণের সমর্থন নিয়ে গড়ে ওঠে দলটি। প্রথম দিকে কিছুটা রক্ষণশীল ইসলামী দলগুলোর সাথে একেপির রাজনৈতিক ও আদর্শিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তবে তুরক্ষের কউর সেক্যুলার রাজনৈতিক পরিবেশে একেপির ইসলাম সম্পর্কে ক্রমধারা নীতির কার্যকরী পদক্ষেপ প্রত্যক্ষ করেছে ইসলামপন্থীরা।

একেপি নিজেদেরকে তুরস্কের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হিসেবে দাবি করে। রাজনৈতিকভাবে মধ্য-ডানপন্থী এই দলটি দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের জন্য শুরু থেকেই সচেষ্ট ছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সফলতা ও উদারবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ধর্মানুসারী নয় এমন ভোটারদের সমর্থনও তারা আদায় করতে

পেরেছে। রেফাহ পার্টি ছেড়ে আসা ব্যক্তিদের হাতে প্রতিষ্ঠিত একেপি সম্পর্কে যদিও শুরুতে অনেকে সন্দিহান ছিল। কিন্তু দলটি অন্যান্য ইসলামপন্থীর তুলনায় রাজনৈতিক বিচক্ষণতা দেখাতে পারায় দেশের প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে জায়গা করে নিতে পেরেছে।

ক্ষমতায় এসে একেপির রাজনৈতিকভাবে ইসলামীকরণের পথ পরিহার করার বিষয়টিকে রক্ষণশীল ইসলামপন্থীরা আদর্শের সাথে কম্প্রোমাইজ হিসেবে ধরে নেয়। আদর্শ নাকি জনস্বার্থ? এমন প্রশ্নে দেখা যায়, সরাসরি ইসলামীকরণের দিকে না গিয়ে বরং জনকল্যাণ ও মানবাধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে একেপি। এক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখতে ইউরোপীয় মানদণ্ডকে (কোপেনহেগেন ক্রাইটেরিয়া) কাজে লাগাতে সক্ষম হয় একেপি সরকার।

তাছাড়া সেক্যুলার আদর্শে ব্যক্তি অধিকার সুরক্ষিত রাখার যুক্তি অনুযায়ী হেডস্কার্ফ ব্যবহারে নারীদের স্বাধীনতা প্রদানে একেপি সরকারের পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবমুখী ও ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে ঢেলে সাজানো, উসমানীয় ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে আরবীকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার ঘোষণাসহ নানা ইস্যুতে পশ্চিমা গণমাধ্যম এরদোয়ানকে 'নব্য সুলতান' হিসেবে আখ্যায়িত করছে। সমালোচকরা এসব পদক্ষেপকে এরদোয়ানের গোপন এজেন্ডা বাস্তবায়ন এবং জনগণের সাথে প্রতারণার শামিল হিসেবে অভিহিত করছে। অথচ বিষয়গুলো এতোটাই 'ওপেন সিক্রেট' যে গুলেন প্রভাবিত মিডিয়া কর্তৃক দুর্নীতির অভিযোগ করার পরও জনসমর্থনের পাল্লা একেপি সরকারের দিকেই বুঁকে আছে।

### সাংগঠনিক কাঠামো

তুর্কি সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ দৃঢ় হওয়ার সাথে সাথে ইসলামপন্থীরা রাজনৈতিকভাবে তাদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়ে উঠে। নিজেদের গড়ে তোলা রাজনৈতিক দলগুলো বারবার নিষিদ্ধ হওয়ার প্রেক্ষিতে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক বিচক্ষণতা গড়ে ওঠে। একবিংশ শতকের শুরুতে প্রচলিত ইসলামপন্থী রাজনৈতিক কর্মসূচি পাশ কাটি গড়ে ওঠে একেপির মতো উদারপন্থী দল। ফলে ইসলামপন্থী রাজনীতিতে প্লুরালিস্টিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত ঘটে। রক্ষণশীল রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি উদার মনোভাবাপন্ন ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। যারা ইসলামকে ব্রান্ড হিসেবে ব্যবহার করতে অনিচ্ছুক। ফলে প্র্যাকটিসিং মুসলিম নয় এমন লোকেরাও এ ধরনের দলকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে। কারণ, এ ধরনের উদারপন্থী দল তুরক্ষের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক যে কোনো ধারা ও কার্যপ্রণালী এড়িয়ে নিজেদের দলীয় সংবিধান প্রণয়ন করে। একেপি এর প্রকৃষ্ট উদারহণ।

### নেতৃত্বের ক্যারিশমা

ন্যাটো থেকে বেরিয়ে আসার হুমকি, ইসরাইল আক্রমণ করে ফিলিন্তিনকে স্বাধীনতা প্রদানসহ পশ্চিমাবিরোধী বক্তব্য দিয়ে রক্ষণশীল ইসলামপন্থীদের কাছে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন এরবাকান। DYP'র নেতা তানসু সিলারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত না করার শর্তে এরবাকানের সাথে তারা কোয়ালিশন সরকার গঠনে রাজি হয়। সমালোচকগণ ওই সময় দুই বিপরীতমুখী আদর্শের রাজনৈতিক মিত্রতায় বেশ কৌতুক অনুভব করে। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এরবাকানের নীতিতে নমনীয়তার ছাপ পাওয়া যায়। ক্ষমতায় আসার আগে ইইউকে খ্রিষ্টানদের ক্লাব হিসেবে অভিহিত করলেও পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ অর্জনের পদক্ষেপ অব্যাহত রাখেন। এছাড়া পশ্চিমা বা ইসরাইলের সাথে পূর্ববর্তী সরকারগুলোর মতো সম্পর্ক ধরে রেখেছিলেন। অর্থনৈতিক দুঃসময়েও আইএমএফের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়া এবং ইরাকের সাথে সম্পর্ক তৈরির প্রচেষ্টার কারণে সে সময় বেশ সমালোচিত হন তিনি। এসব বিষয়ে সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ না করতে পারায় সেকুলারপন্থী তো বটেই, অন্যান্য ইসলামপন্থীদেরও সমালোচনার সম্মুখীন হন। অনেকে মনে করেন, ক্ষমতায় থাকাকালে নমনীয় মনোভাবের কারণে সেনাবাহিনী এরবাকানকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

এরবাকানের মতো জনপ্রিয় নেতৃত্বের পতনের পর তুরস্কের ইসলামপন্থীদের মধ্যে তখন এক ধরনের জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়। বিশেষ করে তুরস্কের মতো কউর সেকুলার পরিবেশে নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, তাই ছিল আলোচ্য বিষয়। পরবর্তীতে ফজিলেত পার্টি গঠনের সময় দলের দৃষ্টিভঙ্গি রেফাহ পার্টির চেয়ে তুলনামূলক উদার ও সদস্যপদের ক্ষেত্রে আরো সহজীকরণের কথা বলা হলেও নেতৃত্ব নিয়ে সংকট দেখা দেয়। তখন স্বাভাবিকভাবেই সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এরবাকান সরকারের সময়ে উপমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা আব্দুল্লাহ গুল ও ইস্তাম্বুলের জনপ্রিয় মেয়র রজব তাইয়েব এরদোয়ানের দিকে। কারণ, উভয়ে উদারবাদী ও বিচক্ষণ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এ দুজনকে এড়িয়ে গিয়ে এরবাকান তাঁর পুরোনো বন্ধু ও সিনিয়র নেতা রেকাই কুতানকে নেতৃত্বে নিয়ে আসেন। ফলে ভিন্ন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উদার ইসলামপন্থীদের কৌশলী চিন্তা বাধাগ্রস্ত হয়। তাই ফজিলেত পার্টির পাশাপাশি আব্দুল্লাহ গুল ও এরদোয়ান মিলে গড়ে তোলেন 'জাস্টিস অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট পার্টি' বা একেপি।

তুরক্ষের ইসলামপন্থী রাজনীতিতে শুরু হয় আরেক অধ্যায়। দলের নেতৃত্বে উঠে আসেন এরদোয়ান। প্রথমদিকে ইসলামপন্থী ব্যক্তিদের নিয়ে দল গঠন করলেও তিনি একেপিকে ইসলামপন্থী হিসেবে প্রকাশ করতে দেননি। আদর্শিকভাবে দলটিকে সামাজিক রক্ষণশীল ও অর্থনৈতিক উদারবাদী হিসেবে তুরক্ষের রাজনীতিতে তুলে ধরতে সক্ষম হন। বহুদলীয় গণতন্ত্রের সূচনা হওয়ার পর তুরক্ষের গণতন্ত্রে সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল তীব্রভাবে। পাশাপাশি ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার

জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপেরও দরকার ছিল। ঠিক এসব সংকটজনক পরিস্থিতিতে ক্ষমতায় আসে একেপি। নিজের উপর রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর ক্ষমতা গ্রহণ করেন এরদোয়ান। দায়িত্ব পেয়ে এরদোয়ান মনোযোগ দেন দেশের সংকটজনক পরিস্থিতিগুলো মোকাবেলায়। জাতীয় ও জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে সরকারের নীতি প্রণয়ন করা হয়। প্রাথমিক এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে একেপিকে তুলে আনেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

শুরুর দিকে সেক্যুলারপন্থী সামাজিক আন্দোলন যেমন ফেতুল্লাহ গুলেনের মতো ব্যক্তিও সমর্থন দেন এরদোয়ানকে। প্রধান বিরোধী দল সিএইচপির শীর্ষস্থানীয় নেতাও এরদোয়ান আমলে তুরন্ধের ইতিবাচক পরিবর্তনের কথা স্বীকার করেন। ফলে সংবিধান সংশোধনসহ গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ও উন্নয়ন পদক্ষেপে এরদোয়ান উদার ও মধ্যপন্থী সেক্যুলারদের সমর্থনও আদায় করে নিতে সক্ষম হন। স্বাধীনভাবে ধর্মীয় মূলবোধ ও গণতন্ত্র চর্চার প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে পরিচিত সেনাবাহিনীকে জনসমর্থনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং সাংবিধানিক আদালতকে আরো গণতান্ত্রিক করার পদক্ষেপ গ্রহণকে জনগণ সমর্থন করে। তবে বিচারক নিয়োগে সরকারের ক্ষমতাবৃদ্ধিকে অগণতান্ত্রিক ও সুশাসন পরিপন্থী বলে অভিযোগ করে থাকে এরদোয়ানের সমালোচকগণ। অন্যদিকে এসব কার্যক্রমকে রাষ্ট্রের টেকসই উন্নয়নের মৌলিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করছে একেপি সরকার।

### উন্নয়ন নাকি সুশাসন

উন্নয়ন ও সুশাসনের প্রশ্নে অনুন্নত, উন্নয়নশীল, উন্নত— এই তিনটা পর্যায়ের রাষ্ট্রগুলোর শাসনপ্রণালী কি একই ধরনের হবে? যে দেশগুলো এখনো তার নাগরিকদের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারে না বা কোনো কোনো দেশ পারলেও তা টেকসই হয়ে ওঠেনি, সেসব দেশে উন্নত রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজ্য 'সুশাসন' ফর্মুলা বাস্তবসম্মত নয়। অপরদিকে, উন্নত রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে 'গণতন্ত্র ও সুশাসনের' সাথে সাংঘর্ষিক পদক্ষেপ চাপিয়ে দেয়ার বহু নজির রয়েছে। জাতিকে উন্নয়নের শক্ত ভিত্তিতে দাঁড় করানোর জন্য শাসক কখনো কখনো স্বৈরশাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত সেসব 'অগণতান্ত্রিক' পদক্ষেপ রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নে মজবুত ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা রাখে। রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও সফলতার জন্য শাসকের দেশপ্রমও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এ বিষয়গুলো বিবেচনা করলে দেখা যায়, বর্তমানকালের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর যেসব নেতা সুশাসনের চেয়ে উন্নয়নকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরের সাথে আজকের তুরক্ষের তুলনা করা যেতে পারে।

#### এরদোয়ান ক্যারিশমা

জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে নানা সময় গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়নে এরদোয়ান সময়ে সময়ে কঠোর মনোভাব দেখিয়েছেন। যেসব মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, তাদেরকে পদচ্যুত করে তিনি অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। এক সময়ের উন্নয়নশীল দেশ তুরস্ক বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অন্যায়ী বিশ্ব অর্থনীতির ১৮তম শীর্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পেছনে এরদোয়ানের সময়োপযোগী পদক্ষেপগুলো কার্যকর হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। রাষ্ট্রের উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে নানা সময় পালন করতে হয়েছে কর্তৃত্ববাদী ভূমিকা। সমালোচনা সত্ত্বেও অগ্রাধিকার বিবেচনায় 'উন্নয়ন অথবা সুশাসন'— এমন ডিলেমায় উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন কর্মসূচিতে। অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত দেশে 'সুশাসন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন উদাহরণ পাওয়া দুষ্কর। মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়াতেও রাষ্ট্রের তৎকালীন ছয়টি মূলনীতিতে 'গণতন্ত্র' স্থান পায়নি। জনসমর্থনের মাধ্যমে উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের স্বার্থে এরদোয়ান কিছু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ আছে। এটি সমালোচকদের দৃষ্টিতে 'সুশাসন' পরিপন্থী মনে হলেও দৃশ্যত তা তুরস্কের উন্নয়নকে টেকসই করেছে। ফলে এক সময়ের বৈদেশিক ঋণনির্ভর তুরস্ক বর্তমানে পরিণত হয়েছে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রে।

তুরক্ষের মতো উন্নয়নমুখী রাষ্ট্রকে শীর্ষস্থানীয় উন্নত রাষ্ট্রের কাতারে নিয়ে যেতে অর্থনীতিকে আরো গতিশীল ও সরকার ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এরদোয়ান জনগণের ঐক্যের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। কুর্দিদের জাতিসন্তা ও ভাষাকে স্বীকৃতি দেয়ার পাশাপাশি জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে অতি রক্ষণশীল ইসলামপন্থা বা কট্টর সেকুলারপন্থার বাইরে উদার ও মধ্যমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। তুরক্ষের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সম্মান প্রদর্শনকারী দল হিসেবে পরিচিত একেপি। ইতোমধ্যে এরদোয়ান তুর্কির সেই অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এতে করে তিনি উদ্দীপ্ত তরুণ সমাজের নিকট ক্যারিশম্যাটিক নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। অনুকূলে পেয়েছেন কর্মোদ্দীপ্ত মধ্যবিত্ত সমাজের বৃহদাংশকে। প্রায় ৯০ বছর ধরে কামালবাদী কট্টর সেকুলার পরিবেশে এরদোয়ানই দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি আতাতুর্কের পর দীর্ঘমেয়াদে তুরক্ষের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন।

### রাজনৈতিক ঐতিহ্য

তুরক্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য খুবই সমৃদ্ধ ও প্রভাবশালী। এক সহস্রাব্দ আগে সূচিত উসমানীয় খেলাফতের সমৃদ্ধ ইতিহাসের নানা উপাদান তুর্কি জাতীয় জীবনে এখনো প্রভাবশালী। সেলজুক তুর্কিদের দ্বারা এ অঞ্চলে ইসলামের রাজনৈতিক ভাবধারার সূত্রপাত হয়েছিল। পরবর্তীতে বুশরা নগরীর উসমান বংশের হাত ধরে তা খেলাফতে রূপ নেয়। কালের পরিক্রমায় তৎকালীন আনাতোলিয়া ছাড়িয়ে গোটা মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকাসহ বিশাল এক ভূখণ্ডের উপর ইসলামী শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। বিভিন্ন ধর্ম ও মতের জনগোষ্ঠী খেলাফতের অধীনে ছিল। মুসলিম মিল্লাতের ধারণা নির্ভর উসমানীয় সাম্রাজ্যকে 'কসমোপলিটন' ধারণার সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। যেখানে জনগোষ্ঠীগুলোর নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ ছিল। খেলাফত পরিচালনায় নিজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল। শাসন কাঠামোতে প্রাদেশিক ব্যবস্থা ও পৃথক বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি উসমানীয় খেলাফতে প্রচলিত ছিল। এসব ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতিগুলো মোটামুটি মেনে চলা হলেও নেতৃত্বে বংশানুক্রমিকতা রক্ষা করাটা মূলনীতির বিপরীত বটে।

প্রতাপশালী এই খেলাফত ব্যবস্থা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সমসাময়িক অন্যান্য সাম্রাজ্যগুলোর তুলনায় উসমানীয় খেলাফত কিছুদিন বেশিই টিকে ছিল। বিংশ শতকের শেষাংশে তুরস্কের রাজনীতিতে ইসলামপন্থীদের উত্থান, বর্তমানে তুলনামূলক উদারপন্থী একেপির রাজনৈতিক ভিশনের সাথে উসমানীয় ঐতিহ্যের উপাদান লক্ষ করা যায়।

## সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

ছোট ছোট স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত তৎকালীন আনাতোলিয়ার জনগোষ্ঠী তাদের বিভক্তিগুলো মূলত ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে কমিয়ে আনার সুযোগ পায়। খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত মুসলিমদেরকে 'মিল্লাত' হিসেবে বিবেচনা করা হতো। উসমানীয় সময়ে তুর্কি সমাজের মূল্যবোধ ইসলামী শিক্ষার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। শরীয়াহভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা, সমাজে আলেমগণের আধ্যাত্মিক প্রভাবের সাথে সাথে সুফিদেরও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান ছিল। পুরো খেলাফত জুড়ে সুন্নী, শিয়া, আলাভী ধারার মুসলমানরা বসবাস করলেও মূল আনাতোলিয়া ভূখণ্ডে হানাফী ও শাফেয়ী মাজহাবের প্রভাব বেশি ছিল। তিনটি মহাদেশের মাঝখানে অবস্থান করায় ইসলামের অনুসারী ছাড়াও খৃস্টান, ইহুদী, জরথুন্ত্রীয়সহ নানা ধর্মানুসারী জনগোষ্ঠী খেলাফতের অধীনে বসবাস করতো। বিচারিক সুবিধার জন্য বেসামরিক আদালত দুটো ধারায় বিভক্ত ছিল। মুসলিমদের জন্য বিচার ব্যবস্থা ছিল শরীয়াহভিত্তিক। আর অন্যান্য ধর্মানুসারীদের জন্য তাদের নিজস্ব আইন অনুসরণ করা হতো।

বহু রকমের সাংস্কৃতিক মনোভাবাপন্ন জনগোষ্ঠী উসমানীয় খেলাফতের অধীনে ছিল দীর্ঘসময় ধরে। যাকে বর্তমানে 'মাল্টি কালচার' সমাজের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল। জনগোষ্ঠীর বৃহদাংশের ভাষা ছিল আরবী। প্রশাসনিক কাজে আরবী প্রাধান্য পেলেও তুর্কি, হিব্রু, গ্রীক, পার্সিয়ান, স্লোভেনিয়ান, কুর্দিসহ বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা অব্যাহত ছিল। সার্বিকভাবে এ সকল জাতিগোষ্ঠীর মুসলিমদের জীবনযাপনে ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব ছিল। তুরস্কে বর্তমানে যে ফেজ টুপি দেখা যায় তা মূলত উসমানীয় সাম্রাজ্যের সময়ে গড়ে ওঠা ইসলামী সাংস্কৃতিক ঐহিত্যের অংশ। এছাড়া সেখানকার স্থাপনাগুলোতে যে শৈল্পিকতার ছাপ পাওয়া যায় তা মূলত খেলাফত সময়ের ইসলামী শিল্পের অন্যতম নিদর্শন।

### ইসলামপন্থীদের ঐক্য

প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সময় হতে ডি-ইসলামাইজেশন প্রক্রিয়া শুরু হলে প্রায় সকল মুসলমান নিপীড়নের শিকার হয়। ডেমোক্রেট পার্টি ক্ষমতায় আসার পর মূলধারার রাজনীতিতে ইসলাম চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হতে থাকে। তবে জনজীবনে ইসলামের উপস্থিতি ছিল মূলত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক নয়। সমাজে আলেম, সুফী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো ধর্মীয় ও নৈতিক পুনর্জাগরণের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। তাদের অধিকাংশই ছিল অরাজনৈতিক। সুফিদের ভ্রাতৃসংঘগুলো (নকশবন্দী, কাদেরিয়া প্রভৃতি) স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সংগঠন তৈরি করে। যাদের অনেকেই আবার সাঈদ নুরসীর দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করতো।

সংগঠনগুলোর মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্যও ছিল। তবে তারা সবাই কামালবাদের চাপিয়ে দেয়া ধর্মহীনতা ও নিপীডনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। কারণ, সবার আদর্শিক কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইসলামকে ঘিরেই। অন্যদিকে, শহুরে অভিজাত শ্রেণী সেক্যুলার শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও তাদের ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের গঠনমূলক প্রভাব রয়ে গিয়েছিল। ষাটের দশক নাগাদ দ্রুত শিল্পায়ন, বৈশ্বিক অর্থনীতির পরিবর্তন, সমাজে নৈতিকতার অবক্ষয় এবং বামপন্থী রাজনীতি ও কমিউনিস্টদের ক্রমবর্ধমান উত্থানজনিত ভীতির ফলে তুরস্কের মুসলমানরা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের গুরুত্ব অনুধাবন করে। এক্ষেত্রে এমন একজন ব্যক্তি মুসলিমদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন, যিনি একাধারে সেক্যুলার শিক্ষায় শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রকৌশলী এবং ব্যবসায়ী। নাজমুদ্দীন এরবাকানই হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি মুসলিমদের মধ্যে ক্রমাম্বয়ে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠা রাজনৈতিক চেতনাকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ১৯৬৯ সালে তিনি 'মিল্লি গুরুশ' নামে একটি ইশতেহার ঘোষণা করেন। এর ফলে তুরস্কের আলেম সমাজে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। ১৯৬৯ সালে আলেম সমাজের সমর্থন নিয়ে ড. এরবাকান স্বতন্ত্রভাবে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে অংশ নেন। পরবর্তীতে তিনি 'মিল্লি নিজাম পার্টি' (ন্যাশনাল অর্ডার পার্টি) গঠন করেন। এর মাধ্যমে তুরস্কের মুসলমানরা দীর্ঘদিন পর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের একটি প্লাটফর্ম খুঁজে পায়।

#### পরিশেষ

সময়োপযোগী চিন্তা ও পদক্ষেপের অভাবে প্রতাপশালী উসমানীয় খেলাফত এক সময় দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তুরস্কে যার স্থান দখল করে প্রতিক্রিয়াশীল সেকুগলারপন্থীরা। প্রতিক্রিয়াশীলদের নিষ্পেষণের ফলে মুসলিমদের মধ্যেও পাল্টা প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অসহনশীলতা। মুসলিম সমাজকে সংকীর্ণতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা থেকে বের করে আনতে কয়েকজন প্রাজ্ঞ ইসলামপন্থী ব্যক্তি নানা মাত্রায় গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সময়ের ব্যবধানে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতে সাধারণ তুর্কি জনগণ প্রতিক্রিয়াশীলতার নেতিবাচকতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে। মুসলিমদের অধিকাংশের কাছে তো বটেই, তুরক্কের সমাজেও ইসলামের সময়োপযোগী ব্যাখ্যাগুলো সম্পর্কে সচেতনতা বাড়তে থাকে।

সমসাময়িক পরিবেশ-পরিস্থিতি একসময় প্রজাতান্ত্রিক তুরক্ষের জনগণের সামনে ইসলামের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচিত করে। তুর্কি সমাজের মূল্যবোধের পরিবর্তন, বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তন, বৈশ্বিক অর্থনীতি— এসবের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে ইসলামপন্থীরা প্রথম দিকে ব্যর্থ হয়। একবিংশ শতাব্দীতে এসে ইসলামপন্থীদের মধ্যে প্রাজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। মৌলিক অধিকার ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে আদর্শিক ও ঐহিত্যবাহী মূল্যবোধও যে সময়ের প্রেক্ষিতে সহায়ক হতে পারে, তা বর্তমান সরকার অনুধাবন করতে পেরেছে।

এটুকু পথ পেরিয়ে আসতে ইসলামপন্থী রাজনীতিকদের বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। কট্টর সেক্যুলারদের আধিপত্যের মুখে বার বার বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। দলীয় নেতৃত্বের সংকটে পড়ে সাংগঠনিক ভাঙ্গনের সুরও বেজেছে সময়ে সময়ে। তারপরও ইসলামপন্থীদের মাঝে উদার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে। সাংগঠনিক বহুত্ববাদিতার প্রচলন ঘটেছে। ভিন্নমত সম্পর্কে বেড়েছে সহনশীলতা এবং কমেছে প্রতিক্রয়াশীলতা। আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা বিবেচনা করতে শিখেছে। সর্বোপরি তারা ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্ব পেয়েছে।

মুসলিম বিশ্ব বলতে যা বুঝায়, সে দেশগুলোর অধিকাংশই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় নিমজ্জিত। সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলো সমাধানে ইসলামপন্থীদেরকে নিজ নিজ দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। পারিপার্শ্বিক উপায়-উপাদানের ভিন্নতাকে বিবেচনায় রেখে তুরক্ষের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার রয়েছে।

#### তথ্যসূত্র:

- 3. M. Hakan Yavuz, *Islamic Political Identity in Turkey*, (Oxford: Oxford University Press, 2003).
- Dr. Ziya Öniş, "Sharing Power: Turkey's Democratization Challenge in the Age of the AKP Hegemony," *Insight Turkey* 15, No. 2 (2013): 103-122
- o. Andrew Mango, *Ataturk: The Biography of the founder of Modern Turkey* (London: John Murray Publishers, 1999), 214.
- 8. Yusuf Ünal, (4 August, 2011), Multi-Culturalism in the Ottoman Empire and its Effects on the Ottoman Social and Intellectual Life [Article]. Retrieved from www.aksitarih.com/multi-culturalism-in-the-ottoman-empire-and-its-effects-on-the-ottoman-social-and-intellectual-life.html
- «. Kemal Kaya, (30 April, 2014), Welfare Policies are the Key to the AKP's Electoral Successes [Article]. Retrieved from www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analystarticles/item/106-welfare-policies-are-the-key-to-the-akp'selectoral-successes.html
- b. David Lepeska, (25 April, 2014), Turkey's rise from aid recipient to mega-donor [Opinion]. Retrieved from http://america.aljazeera.com/opinions/2014/4/turkeyinternationalaidafricasomaliamiddleeasterdorgan.html
- 9. David Capezza, "Turkey's Military Is a Catalyst for Reform: The Military in Politics," *Middle East Quarterly* 16, no. 3 (2009): 13-23.
- ৮. জন এল এসপাসিতো, দ্য ইসলামিক খ্রেট: মিথ অর রিয়েলিটি? অনু. শওকত হোসেন, (ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০০৯)।

# व्यक्तिक स्भारत रेप्रलाभ की आरा किया वात्र है

## নাজমুস সাকিব নির্ঝর

১৯২৪ সালের মার্চ মাসের ৩ তারিখ। এক সময়ের বৈশ্বিক সুপার পাওয়ার সাম্রাজ্য থেকে ক্রমে 'সিক ম্যান অফ ইউরোপ' হয়ে যাওয়া উসমানীয় খেলাফতের খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ সপরিবারে তুরস্ক ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন। এই অক্টের মাধ্যমে যবনিকাপাত ঘটল এমন এক দাওলা'র (আধুনিক 'রাষ্ট্র' পরিভাষার কাছাকাছি); যার কানুন, সামাজিকতা, তামান্দুন বা সংস্কৃতি, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ক, বিচারকের সাথে বিচারপ্রার্থী বা অপরাধীর সম্পর্ক, অর্থনৈতিক চুক্তি বা উত্তরাধিকার, বাণিজ্য বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতি নির্ধারিত হয়ে আসছিল শরীয়াহকে ভিত্তি ধরে। এর মধ্যে অবশ্যই শরীয়াহ থেকে বহু বিচ্যুতি বা ব্যক্তিগত স্থালন ছিল। কিন্তু উসমানীয় খেলাফতের ৬২৩ বছরের আলো ঝলমলে সুবাসিত শাসনামলে কেউ কখনও শরীয়তের এই সেন্ট্রাল অবস্থান নিয়ে 'নতুন' কিছু ভাবারও প্রয়োজনবোধ করেনি। আজকের দিনে তুর্কিতে 'ইসলাম ফিরে আসা' বলতে সেই সোয়া ছয়শত বছরের গৌরবের দিকে হাঁটা আর কল্যাণের অভিগমনই বোঝায়। তাই 'ইসলাম' ফিরে আসার এই বিরাট কর্মযজ্ঞ কীভাবে হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে তা বুঝতে সুবিধা হবে যদি আগে এক নজরে দেখে নেই কীভাবে জনজীবন থেকে ইসলামকে চালভাল আলাদা করার মতো করে তাজানো হয়েছিল।

### কামালের ইউরোপীয়করণ

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন থামল ততক্ষণে উসমানীয় খেলাফত দক্ষিণ দিকে ব্রিটিশ, পূর্বে রুশ আর পশ্চিমে গ্রিকদের মাঝে বিলিবন্টন হয়ে গেছে। মধ্যিখানের আনাতোলিয়ান অঞ্চল টিকে গেল মোস্তফা কামাল পাশা নামের এক সফল উসমানীয় আর্মি অফিসারের নেতৃত্বে। কামাল মনে করতেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের কারণ ছিল ইসলাম। তাই অতীত দুর্ভাগ্যের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হলে ইসলামের

সাথেও সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। যারা পরাজিত করল, কাঙালের মতো তাদের সব মৌলিক ধ্যানধারণা ও জীবনাচরণ গ্রহণ করে নিতে হবে। এ যেন 'কালো মানুষের' 'সাদা' হয়ে ওঠার উদগ্র বাসনা। তাই তিনি উসমানীয় খেলাফতের বহু বিচিত্র জাতিগোষ্ঠীর গৌরব ভুলে একরোখা তুর্কি জাতীয়তাবাদের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিলেন।

মোস্তফা কামাল তুর্কি জাতীয়তাবাদের সমর্থক সামরিক কর্মকর্তাদের জড়ো করে কলোনিয়াল শক্তির মোকাবিলায় সক্ষম হলেন এবং তুর্কি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু প্রথম জাতীয় সাধারণ অ্যাসেম্বলি উসমানীয় খেলাফতের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চেয়েছিল। অ্যাসেম্বলি আইন পাশ করেছিল যে তুর্কির কোনো আইন ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না এবং আইন প্রণয়নের আগে উলামাদের অনাপত্তি নিতে হবে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কামাল পাশা খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল মজিদকে সফট কুরর মাধ্যমে উৎখাত করলেন। ব্যাপারটা সারা মুসলিম জাহানে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া তৈরি করল। ১২৯৯ সাল থেকে চলে আসা মুসলিম জাহান বিস্তৃত উসমানীয় খেলাফতের সাথে কলোনিয়াল সাম্রাজ্যবাদের তফাতটা হল, এই খেলাফত কখনও জাের-জবরদন্তি করে প্রান্ত থেকে সম্পদ লুট করে কেন্দ্রে পাঠায়নি অথবা কেন্দ্রের শিল্পায়নের সুবিধার্থে সীমান্তে জুলুমের নীলকরের জন্ম দেয়নি। এই কল্যাণময়ী খেলাফতের মৃত্যুযাত্রা দেখে মুসলিম মনন ও হদয় হু হু করে কেন্দে উঠেছিল সেদিন। তাই তো সেদিন এই উপমহাদেশেও আমাদের বাপ-দাদা-পরদাদারা রাস্তায় নেমে এসেছিলেন 'খেলাফত আন্দোলনের' জন্য।

তুর্কি জাতির এত বড় নেয়ামত খেলাফত কামাল পাশার সহ্য হলো না। তুর্কির 'অভ্যন্তরীণ' বিষয়ে 'বহিরাগতদের' হস্তক্ষেপের ধোঁয়া তুলে খেলাফতকে পুরোপুরি বিলুপ্ত করে খলিফার পরিবারকে পত্রপাঠ বিদায় দিলেন কামাল।

ইসলাম তাড়ানোর প্রজেক্ট প্রথমে শুরু হয়েছিল ইসলামের উপর থেকে রাজনৈতিক প্রভাব দূর করার নামে। তুর্কির সবগুলো মাদ্রাসা বন্ধ করা হলো। সেকুগলার ও 'নন-ডগম্যাটিক' চিন্তাধারার পড়াশোনা চালু করতে অন্য সকল ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বন্ধ করা হলো। জাতীয় অ্যাসেম্বলির আইন বিশ্লেষণের জন্য তৈরি শরীয়াহ কাউন্সিল ভেঙ্গে দেয়া হলো। সুবিশাল ওয়াকফ (ইসলামী দানে পরিচালিত আজীবনের ফাউন্ডেশন) অর্থনীতি গুঁড়িয়ে দেয়া হলো। সুফী খানকাগুলো জোর করে উচ্ছেদ করা হলো। সকল কাজীর চাকরি বাতিল ও শরীয়াহ কোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হলো।

ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ না করার ব্যাপারে পশ্চিমা আলোকায়নের (enlightenment) একটা বড়াই বরাবরই আছে। কিন্তু সেই আলোকায়নের স্বঘোষিত রুহানী সন্তান মোস্তফা কামাল ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম পালনটা মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই তিনি নিম্নোক্ত কর্মসূচি ঘোষণা করলেন:

- পুরুষদের জন্য ইসলামী অতীত মনে করিয়ে দেয় এমন পোশাক (য়েমন
  ফেজ টুপি বা পাগড়ি) নিষিদ্ধ হলো; পশ্চিমা হ্যাট বাধ্যতামূলক হলো।
- নারীদের গৌরব হিজাব নিয়ে হাসি-তামাশা করা শুরু হলো এবং পাবলিক প্লেসে হিজাব নিয়িদ্ধ করা হলো।
- রাসুলুল্লাহর (সা.) হিজরত থেকে প্রচলিত হিজরী ক্যালেন্ডার বাতিল করে
   'যীশু খ্রিষ্টের' জন্মের উপর ভিত্তি করে শুরু গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার চালু হলো।
- ১৯৩২ সালে আরবীতে আযান দেয়া বন্ধ করা হলো এবং তুর্কির হাজার হাজার মসজিদে তুর্কি ভাষায় আযান বাধ্যতামূলক করা হলো।
- জুমাবারের সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল করে শনি-রবিবারের ইউরোপীয় ছুটি চালু হলো।

এই সব কাহিনী বাস্তবায়ন শেষে, শরীয়াহ মেনে চলার যে ঢং জাতীয় অ্যাসেম্বলি শুরুতে করছিল তাও খোলাখুলিভাবে ঝেড়ে ফেলে দিলো এবং কামালের সেকুলার দর্শন দিয়ে ইসলামকে প্রতিস্থাপিত করা হলো। কামাল জাতীয়তাবাদকে কত শুরুত্বপূর্ন মনে করতেন আর ইসলামকে কতটা ফালতু মনে করতেন সেটা তার নিজের ভাষায় এ রকম: "আরবদের ধর্ম (ইসলাম) গ্রহণ করার আগে থেকেই তুর্কিরা একটা মহান জাতি হিসাবে হাজির ছিল। আরবদের ধর্ম গ্রহণ করার পর, এই ধর্ম আরব, ইরানী, মিশরীদের সাথে তুর্কিদের মিলিয়ে একটা একক জাতি বানিয়ে দিতে পারেনি। বরং এই ধর্মটা তুর্কি জাতির বন্ধনকে শিথিল করেছে আর জাতীয় উদ্দীপনাকে করেছে ভোঁতা। এটাই হওয়ার কথা ছিল। কারণ মুহাম্মাদ যে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটার উদ্দেশ্যই ছিল অপরাপর জাতির উপর আরবের জাতীয় রাজনীতি চাপিয়ে দেয়া।" [মোস্তফা কামাল, সভ্যতার কথা (Medenî Bilgiler)]

কামাল তরুণদের কাছে অতীতকে পাঠ-অনুপোযোগী (unreadable) করে তুললেন। ফার্সি ও উর্দুর মতো তুর্কি ভাষাও আরবী হরফেই লেখা হতো। তুর্কি ভাষার বহু আরবী শব্দের মিশেল ছিল। ফলে তুর্কিরা খুব সহজেই আরবী ভাষার ইসলামী সাহিত্য পড়তে পারতেন। কামাল আরবী হরফ নিষিদ্ধ করে দিলেন। একটা নতুন কমিশন করে দিলেন যাদের একমাত্র কাজ ছিল অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে আরবী, ফার্সিসহ অন্যান্য ভাষা থেকে আসা শব্দ খুঁজে তা বাদ দিয়ে তুর্কি ভাষাকে 'বিশুদ্ধ' করা। ফলে নতুন প্রজন্ম যে ভাষায় শিক্ষা ও দাপ্তরিক কাজে অভ্যন্ত হয়ে উঠলো, তা ঠিক আগের প্রজন্ম থেকে বহুমাত্রায় ভিন্ন। নতুন ল্যাটিন হরফের লেখাই হলো কামাল পাশার কাছে সহনীয়। ফলে তুর্কির ইতিহাস হয়ে দাঁড়ালো কামালের ইতিহাস। এক নতুন জেনারেশন তৈরি হলো, যাদের সাথে শিকড়ের কোনো যোগ নেই। ২০১১ সালের কোনো এক বিকালে

ইস্তামুলের রাস্তায় এক তুর্কি তরুণ আমাকে বলছিল, চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে এমনও সময় গেছে যখন তুর্কি শিশু, কিশোর, যুবা জানত না অযু বা গোসল কীভাবে করতে হয়। শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের ফল বোধহয় এমন (উদ্ভট) আশ্চর্যই হয়।

## ইসলামী পুনর্জাগরণের সূচনা

কামাল পাশার ইসলাম খেদানো কর্মসূচি একদিকে যখন চলছিল, আরেকদিকে তখন ইসলামের 'সন্তানরা' ঠিকই জান দিয়ে ইসলামের পতাকা ধরে মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে, তুর্কির লোকেরা ইসলাম সম্পর্কে জানে একজন লোকের কারণে। তিনি বিদউজ্জামান সাঈদ নুরসী। তিনি পাহাড় থেকে পাহাড়ে ইসলাম সাথে নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছিলেন। আর তাঁর লেখা তাফসীর 'রিসালায়ে নুর' তাঁর সহচররা হাতে হাতে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন ইজমির থেকে গাজিয়েনতেপ, ইস্তাম্বল থেকে কায়সারি পর্যন্ত। গ্রামের পাহাড়ে বসে লেখা বই নাড়িয়ে দিচ্ছিল আঙ্কারার তথত।

এই মহান পুরুষের রুহানী সন্তানেরা বার বার চেষ্টা করেছেন ইসলামকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। ষাটের দশক থেকে শুরু করে প্রতি দশকে কমপক্ষে একবার করে তাদের সেই চেষ্টাকে ক্যু, ফাঁসি, গণহত্যা, জেল, রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা, সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা ইত্যাদির মাধ্যমে 'আতাতুর্কে'র 'সন্তান'রাও রুখে দিয়েছেন। একবার নয়, বারবার এই ঘটনা ঘটেছে। সত্তরের দশকে তুরস্কের অবিসংবাদিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব নাজমুদ্দীন এরবাকান শুরু করেন মিল্লি গুরুশ বা ন্যাশনাল ভিশন আন্দোলন। মোটাদাগে, এটাই ছিল তুর্কির ইসলামপন্থী আন্দোলন। আজকের এরদোয়ান, গুল, দাউতোগলুসহ সকল ইসলামী নেতা হোজ্জা এরবাকানের প্রত্যক্ষ বা রুহানী ছাত্র। ১৯৯৭ সালে যখন এরবাকানের নির্বাচিত ইসলামপন্থী সরকারকে মাত্র ৮ মাসের মাথায় ক্যু করে উৎখাত করা হলো, তখন ইস্তাম্বুলের সাবেক মেয়র এবং তুখোড় তরুণ ইসলামী নেতা রজব তাইয়্যেব এরদোয়ান ও আবুল্লাহ গুল একটি আপাত মধ্যপন্থী ধারার রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করলেন। দলের নাম 'আদালেত ওয়া কালকিনমা পার্টিসি', ডাকনাম আক পার্টি বা একেপি: ইংরেজিতে জাস্টিস অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট পার্টি। একদিকে এই দলের ঘোষিত মূলনীতি ছিল ইসলামনিরপেক্ষ, অন্যদিকে মূল নেতৃত্ব ছিল ইসলামী তানজীম (সংগঠন) ও তরবিয়্যাতে (প্রশিক্ষণ) ঋদ্ধ কিছু ব্যক্তিত্ব। কাজেই আমরা দেখি, হুলিয়া মাথায় নিয়ে হাই স্ট্যাটাসের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বিলাসী চাকরি ছেড়ে এই নতুন বিনির্মাণে এক কাপড়ে চলে আসতে পেরেছিলেন আব্দুল্লাহ গুল এবং আরো অনেকে। ২০০২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত বারংবার সব ধরনের স্থানীয় বা জাতীয় নির্বাচনে নিরংকুশভাবে জয়লাভ করে চলেছে এই আক পার্টি।

### এরদোয়ানদের কি আসলে কোনো ইসলামী এজেন্ডা আছে?

এত কিছুর পর আসলে প্রশ্নটা নিজেই নিজের জবাব দিতে পারছে (self explanatory)। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, অনেকে মনে করেন এরদোয়ানের কোনো ইসলামী এজেন্ডা নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে ইসলামী আন্দোলনের এমন কর্মীর সাথে কথা বলেছি, যিনি মনে করেন এরদোয়ান পশ্চিমাদের এজেন্ট। একজন মানুষ আসলে কী বিশ্বাস করেন, সেটা অন্তরের ভেতরে ঢুকে বোঝা সম্ভব নয়। বরং মানুষ বাঁচে তার কাজের মধ্য দিয়ে। বৃক্ষ তোমার নাম কী? ফলে পরিচয়। আসুন দেখি এরদোয়ানরা গত ১২ বছরে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আন্তর্জাতিক ও ব্যক্তিজীবনে কী ধরনের সংস্কার নিয়ে এসেছে এবং সেই সংস্কারগুলো বিবেচনার সময় আমরা খেয়াল করবো একজন নিরেট স্বার্থবাদী মানুষ, যার কোনো ইসলামী এজেন্ডা নেই, তার পক্ষে এ ধরনের কাজ করার জন্য কী ধরনের প্রণোদনা থাকতে পারে।

ইমাম হাতিপ স্কুলের (তুর্কি মাদ্রাসা সিস্টেম, এরদোয়ান নিজেও এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন) প্রত্যেক ছাত্র ইদানীং একটা করে ট্যাবলেট কম্পিউটার পায়। সাধারণের তুলনায় এটা অতিরিক্ত একটা সুবিধা। তাদের শিক্ষাদান হয় ডিজিটাল পদ্ধতিতে, অথচ সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা এখনও বড় বড় পাঠ্যবই থেকে বেরুতে পারেনি। ইমাম হাতিপ স্কুলের ক্লাসরুমের ডেকগুলোও ডিজিটাল, আর বাস ভাড়া অন্য স্কুলের তুলনায় অর্ধেক। সাম্প্রতিক একটা নতুন আইনে ইমাম হাতিপ স্কুল থেকে পাশ করা ছেলেমেয়ের জন্য যে কোনো বিষয়ে উচ্চতর পড়াশুনা ও সরকারী চাকরি করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। ইমাম হাতিপ স্কুলের সংখ্যা প্রায় ৯০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২ সাল থেকে স্কুলগুলোতে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অনেকেই মনে করেন, এই নতুন শিক্ষানীতির প্রভাব পড়বে বছর বিশ পরে নতুন প্রজন্মের উপর। কারণ, এসব ইসলামী শিক্ষা আসলে একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী আহবান। হৃদয় মনে এর প্রভাব পড়ারই কথা। সম্প্রতি এরদোয়ান বলেছেন, হাইস্কুলে আরবী হরফ ও আরবী ফার্সি শব্দ মিশ্রিত উসমানীয় তুর্কি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। মুস্তাফা কামালের আরবী হরফ ব্যান করাকে তিনি গর্দানের শাহরগ কেটে ফেলার সাথে তুলনা করে বলেছেন, "ইতিহাস লেখা আছে পূর্বপুরুষের সমাধি পাথরে, তোমরা (তরুণরা) যদি তা পড়তেই না জানো, এর চাইতে বড দর্বলতা আর কোনটা হতে পারে?"

আক পার্টির আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই একটা মুসলিম স্বার্থঘোঁষা অ্যান্টিভ ফরেন পলিসি দেখা যাচ্ছে। এরদোয়ান যেমনটা বলেছিলেন নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্সের এক প্রোগ্রামে, "ফিলিস্তিন ইস্যু, ইরাক ও সিরিয়ার সংকট, ক্রিমিয়া বা বলকান— এসব কিছুর জন্মই হয়েছে উসমানী খেলাফতের পতনের পর। তুর্কি এসব কিছুই ভালো বুঝে, অনুধাবন ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা রাখে। কারণ এ অঞ্চলের ইতিহাস হচ্ছে আমাদের যৌথ ইতিহাস।"

গাজায় ফ্রিডম ফ্লোটিলা পাঠানো থেকে সোমালিয়া বা আরাকানের মতো দূরবর্তী অঞ্চলে ত্রাণ দেয়া, আফ্রিকায় ২৭টা নতুন দূতাবাস খোলা, বাশার আল আসাদের সৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে চলমান গণপ্রতিরোধকে সব ধরনের সাহায্য দেয়া এবং সিরিয়ান রিফিউজিদের জন্য সবচাইতে বড় শরণার্থী শিবির খোলা কিংবা ইখওয়ানুল মুসলিমুনের নির্বাসিত নেতৃবৃন্দকে আশ্রয় দেয়া আর সিসির সামরিক জান্তার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা, অথবা বাংলাদেশে সিলেক্টিভ মব লিঞ্চিং তথা ফাঁসি ফাঁসি ফাঁসি উৎসবের ব্যাপারে আন্দুল্লাহ গুলের তরফে উদ্বেগ জানিয়ে চিঠি লেখা— এসব কিছুকে গুধু একটা তত্ত্ব দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায়, সেটা হলো ইসলামী ভ্রাতৃত্বের পররাষ্ট্রনীতি। এটা এখন ওপেন সিক্রেট যে উসমানী খেলাফতের আদলেই চলছে তুর্কির ফরেন পলিসি। সেজন্যে একাডেমিক মহলে এরদোয়ান-গুল-দাউতোগলুদের বলা হয়ে থাকে নিও-অটোমান বা নয়া উসমানী।

কামালের ইউরোপীয়করণ প্রজেক্টের পর থেকে স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েরা হিজাব পরতে পারতো না। এরদোয়ান সরকার বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুলের উপর থেকে দুই ধাপে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়েছে। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর থেকেও এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়েছে। এর আগে সেক্যুলার এলিটরা ইসলামপন্থী অথবা পরহেজগারদের উত্থান রোধে এইসব নানান ফন্দি-ফিকির তৈরি করে রেখেছিল। এরদোয়ান একদিকে মেয়েদের ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্থাৎ হিজাব গ্রহণ বা বর্জনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করছেন, অন্যদিকে মেয়েদের অনুরোধ করছেন পরহেযগারী অবলম্বন করতে। তিনি এক বক্তৃতায় বলেছেন, নারী ও পুরুষের ফিতরাত (জন্মগত স্বকীয়তা) আলাদা এবং কখনও তা সমান নয়। বিশ্ববিদ্যালয় পড়য়া তরুণীদের তিনি নসীহত করেছেন, তারা যেন বিয়ের সময় পাত্র পছন্দে বেশি খুঁতখুঁতে না হয়। এদিকে প্রধানমন্ত্রী দাউতোগলু বলেছেন, পশ্চিমা বিশ্ব যে নারী-পুরুষ একাকার করার চেষ্টা করছে, এর সাইড ইফেক্ট হচ্ছে হতাশা এবং আত্মহত্যার হার বৃদ্ধি। অথচ জিডিপির দিক থেকে এসব দেশ পৃথিবীর শীর্ষে। তিনি বলেছেন, "একজন পুরুষ যেসব পরিশ্রমসাধ্য কাজ করে, কোনো গর্ভবতী নারীকেও বেঁচে থাকার জন্য সেসব কাজই করতে হবে, এমনটা আমরা কখনও মেনে নেব না। কারণ, সন্তান জন্ম দেয়া হচ্ছে একটা আসমানী কাজ যার উপর নির্ভর করে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব। আর এটা যিনি করবেন সেই মায়ের অধিকার আছে পরিশ্রম থেকে মুক্তির।" ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী বুলেন্ত আরিঞ্জ কিছুদিন আগেই মেয়েদের অনুরোধ করেছেন, তাঁরা যেন নৈতিকতা ও পরহেজগারীর পথই বেছে নেয়, পাবলিক ডিসপ্লে হয়ে লাস্যময়ী 'বস্তু'তে পরিণত না হয়।

এরদোয়ানের ঘোষিত শত্রুরা মনে করেন, এরদোয়ান তুর্কিকে বিপ্লবোত্তর ইরান বা তালেবানদের আফগানে পরিণত করেননি ঠিকই, তবে কামাল পাশার তুর্কির খোলনলচা অনেকটাই বদলে দিয়েছেন। মোস্তফা কামাল বলতেন, "আমরা একদল

সেকুগুলার দেশপ্রেমিক চাই।" আর এরদোয়ান প্রায়শই বলে থাকেন, "আমরা একটা পরহেজগার প্রজন্ম গড়ে তুলছি" এবং একটা 'নয়া তুরস্ক' আমাদের গন্তব্য। এরদোয়ানের সমালোচকরা অনেকেই মনে করেন ইসলাম চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে না ঠিকই: কিন্তু পলিসি নির্ধারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আক পার্টির এক ধরনের রক্ষণশীল ঝোঁক, সামাজিক বিষয়াদিতে সরকারী মদদে নৈতিকতা ছড়ানোর চেষ্টা স্পষ্ট। যেমন ধরা যাক কোনো সিনেমা বা মঞ্চ নাটকে যদি এমন ডায়ালগ থাকে— "I want to sleep with you", তাহলে খুব সম্ভবত সেই নাটক বা সিনেমা তুর্কিতে আর আলোর মুখ দেখবে না। যেসব সরকারী থিয়েটার বা অপেরা হাউজ সরকারী ফান্ড পায় সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ এখন এরদোয়ানের 'পরহেজগার জেনারেশনের' হাতে। কাজেই এর একটা পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে প্রোডাকশনের উপর। গত বছর মদের উপর সরকার কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। যে কোনো প্রকার মদের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ এবং গভীর রাতে এর বেচাবিক্রিও নিষিদ্ধ। এখন আর সব জায়গায় মদ বেচাও যাবে না। সরকারী একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এসব কাজের কারণ ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, আমরা কেবল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রেগুলেশন যথাযথভাবে মেনে চলার চেষ্টা করছি। এখানেও ইসলামী ঝাণ্ডা না উডানোর সচেতন ও কৌশলী ভূমিকা সহজেই চোখে পড়ে।

এক কথায়, তুর্কির রাস্তায় হাঁটলে আপনার চোখে পড়বে অনেক বেশি হিজাব; মসজিদের সংখ্যাও গেছে অনেক বেড়ে। ইসলামী দাওয়াত আগের চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী আর মসজিদে লোক আসছে অনেক বেশি। বিখ্যাত তুর্কি সাংবাদিক মোস্তফা আকিউল বলেন, "আগের দিনে একজন আদর্শ তুর্কি ছিলেন তিনিই যিনি পরহেজগার নন, আর এখন এর ঠিক উলটা। আপনি যদি মদখোর হন, একেপির রাজ্যে আপনার খবর আছে, এখানে আপনার জায়গা খুঁজে নিতে কন্ত করতে হবে। এই লোকগুলা আসলে ধীরে ধীরে পুরো ব্যাপারটার উপরের দিক নিচে আর নিচের দিক উপরে এনে উলটে-পালটে দিচ্ছে।" এখন শুরুর প্রশ্নে ফিরে যাই, এরদোয়ানের কি আসলে কোনো ইসলামী এজেন্ডা আছে? বৃক্ষ তোমার নাম কী? ফলে পরিচয়।

### কীভাবে এসব সম্ভব হলো?

এরদোয়ানরা ক্ষমতায় এসে প্রথম বছরগুলোতে কিছু ইসটিটিউশন গড়ে তোলায় গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন। জোর-জবরদন্তি করে ক্ষমতায় থাকা কামালিস্ট দলটির অদ্ভুত অর্থনৈতিক দর্শনের কারণে তুর্কি অর্থনীতি নিজেকে মোটেই মেলে ধরতে পারছিল না। এরদোয়ানদের সাথে যারা আক পার্টি গড়ে তোলায় এগিয়ে এসেছিলেন এদের অনেকেই এসেছিলেন মূলত অর্থনৈতিক দর্শনে মিল থাকার কারণে, ধর্মীয় রক্ষণশীলতার কারণে নয়। এরদোয়ানের পার্টি যে অর্থনৈতিক কর্মসূচি হাজির করেছিল সেটা ছিল উদারনৈতিক পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের জন্য খুবই উপযোগী। এছাড়া

একটা ব্যবসায়ী প্রজন্ম এরদোয়ানের কমরেড হয়েছেন যাদের বলা হয়ে থাকে আনাতোলিয়ান টাইগার্স। এরা খুব ঝানু ব্যবসায়ী আর ব্যক্তিগতভাবে পরহেজগার। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সবসময় আইনের শাসনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আক পার্টি প্রশাসনযন্ত্রের উঁচু স্তরে অন্তত একটা গুণগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন যাতে ব্যবসায়ীদের মনে এই আশ্বাস জন্মেছিল যে এখানে ব্যবসা করলে চাঁদাবাজি আর লাল ফিতার দৌরাত্ম্য সহ্য করতে হবে না। মাত্র ৫-৮ বছরের ব্যবধানে তুর্কি অর্থনীতি বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি, অবকাঠামো নির্মাণ, রপ্তানী বহুগুণ বৃদ্ধির এমন সব শক্তিশালী চমক হাজির করা শুরু করে, যেগুলো ছিল যে কোনো অর্থনীতিবিদের জন্য ঈর্যবায় একটা সাফল্যের তরিকা বা রেসিপি। জিডিপি গেল অনেক বেড়ে। বিশ্বব্যাংকের ডাটা বলছে, ২০০৫ সালে মাথাপিছু আয় ছিল ৬ হাজার ডলারের একটু বেশি আর ২০১৩ সালে এটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ডলারের উপরে। মূলত অর্থনৈতিক শক্তিই হচ্ছে এরদোয়ানদের পায়ের নিচের সেই মাটি যার উপরে শক্তভাবে দাঁডিয়ে এরদোয়ান তাঁর অন্য এজেন্ডা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

তুর্কি ইসলামপন্থীদের একটা বড় অংশ হচ্ছে গত শতকের ষাট থেকে নব্বইয়ের দশকে গ্রাম থেকে শহরে আসা ইমিগ্রেন্ট জনশক্তি। এই সময়টা তুর্কির নগরায়নের সময়। বলাই বাহুল্য, রাজার নীতি নিয়ন্ত্রণ করে শহর। শহুরে মডার্নিটির ইট পাথরে এই জনগোষ্ঠী গডহাজির থাকতেন আর ব্যাগে করে নিয়ে এসেছিলেন আনাতোলিয়ান ইসলামের সগন্ধ। রাজনীতি বা সংস্কৃতি, শিক্ষা বা ব্যবসা এসব কিছতেই তাঁরা খুঁজেছেন একই ফ্লেভারের কোনো গ্রুপ। এই গ্রুপ একদিকে যেমন ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক সমর্থন দিয়েছে, অন্যদিকে সামাজিক কর্মকাণ্ডে ওয়াকফ ও দান করার আনাতোলিয়ান সংস্কৃতিকে পুরোপুরি জারি রেখেছে। এর ফলে সামাজিক সেবার এক বিরাট নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে। এসব নেটওয়ার্কের অনেকগুলোই বিভিন্ন সৃফী খানকা দ্বারা উদ্বদ্ধ বা জড়িত। কিন্তু হাল আমলের কিছ ব্যতিক্রম ছাড়া এসব সামাজিক সেবার নেটওয়ার্ক সবসময় ইসলামপন্থী আন্দোলনের সহায়ক শক্তি হিসাবেই কাজ করে গেছে। অন্তত জনগণের চোখে ইসলামপন্থী আন্দোলন আর এইসব সামাজিক কর্মসূচি যা আসলে একটা সমান্তরাল রাষ্ট্রের মতোই — সকল বিপদে-আপদে মানুষের কাজে এসেছে, এদের মধ্যে কোনো ফারাক চোখে পডেনি। এসব নেটওয়ার্কের রয়েছে হাজারো স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং, এনজিও, রাইটার্স গিল্ড, বহু পত্রিকা, বেশ কিছু টিভি চ্যানেল আর প্রকাশনা সংস্থা। এই পুরো কর্মযজ্ঞ ও যন্ত্রই ইসলামীকরণের ইঞ্জিন হিসাবে কাজ করেছে। সমাজের ইসলামীকরণ আগে হয়েছে নিচ থেকে উপরে (bottom up), আর সরকারযন্ত্র উপর থেকে নিচে এই কাজের হাল শক্ত করে ধরে রেখেছিল। একদিকে সামরিক বাহিনী ও সেক্যুলার এলিটের তৈরি 'দেরিন দৌলাত' বা ডিপ স্টেট প্রতি দশকে ক্যু করে রাজনৈতিকভাবে ইসলামপন্থী আন্দোলনকে বনসাই করে রাখতে চেয়েছে। অন্যদিকে, ইসলামপন্থী গ্রুপগুলো সমাজের

ইসলামীকরণ প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ করে দিয়েছে। সব ডিম এক ঝুঁড়িতে না রেখে পোর্টফলিও ডাইভার্সিফাই নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সময় মতো সবকিছু একই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের দিকে 'ক্লিক' করেছে। এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে অসম্ভব মেধাবী, কৌশলী ও দুনিয়াদারীর বুঝওয়ালা একদল অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতৃত্বের হাতে। স্মরণ করা যেতে পারে, এই লোকগুলো কীভাবে নিয়মিত ইউরোপীয়, ইসরাইলী বা আমেরিকান ডিপ্লোম্যাটদের নাকানি-চুবানি খাওয়ান।

তুর্কির ইউরোপমুখী অভিগমন একদিকে যেমন বহু খারাপ বিষয়ের আমদানি করেছে, অন্যদিকে কিছু ভালো ইসটিটিউশন (প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি অর্থে) বয়ে এনেছে। এর একটা হচ্ছে একটা উদারনৈতিক স্পেস তৈরি করা। এই স্পেস একটা সুস্থ বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ হাজির করেছে। এই পরিবেশ এক রকমের বুদ্ধিবৃত্তিক সহনশীলতা জন্ম দিয়েছে। কী জানি কেন যেন মনে হয়, বাংলাদেশে একদিকে পশ্চিমাকরণ হচ্ছে আর অন্যের চিন্তা গ্রহণ করা বা নিদেনপক্ষে অন্যের মত শোনার মতো সহনশীলতা শুন্যের দিকে যাচ্ছে। এরদোয়ানরা ইইউতে তুর্কির একীভূতকরণের যে মুলাটা ঝুলিয়েছিলেন, তা ছিল এই সিভিল স্পেস ব্যবহার করার সুবিধার স্বার্থে। এই এক মুলা ঝুলিয়ে রাজনীতি থেকে সেক্যুলার-মিলিটারি আঁতাতের 'ডিপ স্টেট'কে একদম ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছেন। কেননা ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড দাবি করে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং কিছু অনস্বীকার্য সিভিল রাইটস। মিলিটারি ছিল সেক্ষেত্রে একটা বাধা। ইইউতে যাওয়ার কথা বলে সেগুলো সহজে দূর করা সম্ভব হয়েছে। জুডিশিয়াল রিফর্মও হয়েছে একই সাথে। এর আগে জুডিশিয়ারির কাজই ছিল অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ নিয়ে দেখা যে কোথাও সেক্যুলারিজম এতটুকু 'দুষিত' হয়ে গেল কিনা। পরে যখন ইইউ তুর্কিকে নিতে অনাগ্রহ দেখালো, ততদিনে রিফর্ম যা হবার হয়ে গেছে এবং সেক্যুলার এলিট ডিপ স্টেট পরিণত হয়েছে এক দন্তনখবিহীন বাঘে। এসব কিছর পর দাউতগল আলজাজিরার সাথে এক সাক্ষাৎকারে যখন বলেছিলেন, "এ বছর ইউরোপীয় ইউনিয়নে বেকারত্বের সংখ্যা ছিল এক মিলিয়ন, একই সময়ে তুরস্ক নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করেছে এক মিলিয়ন। তুর্কি যদি ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকত তাহলে ইইউতে কোনো বেকারত্বই থাকত না।" তখন ব্যাপারটা যথেষ্ট কৌতুককর হয়েছিল সন্দেহ নাই। এখন অনেকে প্রশ্ন তোলেন ইইউতে ঢোকার কোনো ইচ্ছা আদৌ আক পার্টির ছিল কিনা। নাকি এটা ছিল স্রেফ নিজেদের এজেন্ডা হাসিল করার একটা উপায় এবং ব্যবহার শেষে এরদোয়ানের দল সেটাকে টিস্য পেপারের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

এর সাথে যোগ হয়েছে একটা ন্যূনতম মান পর্যন্ত সার্বজনীন শিক্ষা। বর্তমানে তুর্কি স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্সটিটিউটের ডাটা বলছে, সাক্ষরতার হার ৯৮.৭৮%। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে এটা ৫৮% এর কাছাকাছি। শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে আদর্শবাদী কোনো

উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত করা যত সহজ, অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সেটা ততটা সহজ নয়। বিশেষত তা আরো কঠিন যদি পেটে ক্ষুধা থাকে। একবেলার ভালো খাবার আর ভোট এইসব দেশে তাৎপর্যের দিক থেকে খুব কমই পার্থক্য বহন করে।

আরেকটা ব্যাপার সম্ভবত তুর্কিদের ক্ষেত্রে খুব সহায়ক ছিল। ইসলামপন্থীরা শুধু উসমানী খেলাফতের ৬২৩ বছরের গৌরবজ্জ্বল অতীতের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে সেদিকে ফিরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করাই জনসমর্থন মোবিলাইজ করার জন্য অনেক বড় শক্তি ছিল। মোস্তফা কামাল বই পুস্তক উলটে-পালটে দিয়েছেন, কিন্তু অলিগলিতে গগনচুম্বী সুউচ্চ মিনারগুলো তো এখনো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে উসমানী খেলাফতের গাঁথা আর গৌরব।

#### তথ্যসূত্র

- আক পার্টি অফিসিয়ালদের সাথে লেখকের ব্যক্তিগত ইন্টারভিউ, ইস্তামুল ২০১১।
- 2. David Lepeska, (20 November, 2014), Turkey's long game: how 12 years of AKP rule has eroded the secular state [Review]. Retrieved from www.thenational.ae/arts-lifestyle/the-review/turkeys-long-game-how-12-years-of-akp-rule-has-eroded-the-secular-state
- o. How Atatürk Made Turkey Secular [Article]. Retrieved from www.lostislamichistory.com/how-ataturk-made-turkey-secular
- 8. নিমিমা বিনতে মুহম্মদ, (২৮ নভেম্বর, ২০১৪), *এরদোগানের তুরস্ক: বিদায়ের পথে সেকু্যুলারিজম? পর্ব-১* [পর্যালোচনা]। ওয়েব লিংক: www.bdmonitor.net/newsdetail/detail/49/100482
- ৫. নিমিমা বিনতে মুহম্মদ, (২৯ নভেম্বর, ২০১৪), *এরদোগানের তুরস্ক: বিদায়ের পথে সেক্যুলারিজম? পর্ব-২* [পর্যালোচনা]। ওয়েব লিংক: www.bdmonitor.net/newsdetail/detail/49/100675
- Helen Rose Ebaugh, The Gülen Movement: A Sociological Analysis of a Civic Movement Rooted in Moderate Islam (New York: Springer, 2009)

# तरा। यूरास्क धर्म ७ गनउन्

মোস্তফা আকিউল, ক্রিস্টা টিপেট | অনুবাদ: আবিদুল ইসলাম চৌধুরী

### প্রথম পর্ব

[APM-এর On Being অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সাথে আছি আমি ক্রিস্টা টিপেট।
মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। আরব দুনিয়ার স্বৈরশাসকদের
দিনও শেষ হয়ে আসছে। এ অবস্থায় এখানকার মানুষগুলো স্বপ্ধ দেখতে শুরু
করেছে। গণতান্ত্রিক তুরস্ক হলো তাদের স্বপ্নের অনুপ্রেরণা। শতকরা ৯৮ জন তুর্কিই
ইসলামের অনুসারী। বিভিন্ন দিক বিবেচনায় দিন দিন তুরস্কের গুরুত্ব বাড়ছে।
দেশটির অর্থনীতির কলেবর দিন দিন বৃদ্ধি পাছেছে। ইউরোপ ও এশিয়ার মাঝখানের
এই দেশটির সাথে গ্রীস, ইরান ও সিরিয়ার সীমান্ত রয়েছে। দেশটা 'নয়া তুরস্ক'
হিসেবে গড়ে উঠছে বলে প্রায়শ বলা হয়। 'নয়া তুরস্কের' কারিগররা উসমানীয়
খেলাফতের ঐতিহ্যের আলোকেই দেশকে গড়ে তুলছেন।

বিংশ শতক পর্যন্ত প্রায় ছয়শত বছর ধরে উসমানীয় খেলাফত টিকেছিল। এখানে মুসলমানদের পাশাপাশি বিপুলসংখ্যক খ্রিষ্টান ও ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের বসবাস ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই খেলাফতের পতন ঘটে। মোস্তফা কামাল পাশা খেলাফত ভেঙ্গে দিয়ে তুরস্ককে সেক্যুলার আদর্শে একটি জাতিরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলেন।

সম্প্রতি ইস্তামুল সফর করে আমি তুর্কি রাজনৈতিক বিশ্লেষক মোস্তফা আকিউলের

<sup>&#</sup>x27;আমেরিকান পাবলিক মিডিয়া'র (এপিএম) রেডিও শো On Being প্রোগ্রামের উপস্থাপিকা ক্রিস্টা টিপেট ২০১২ সালের জুলাইয়ে সুপরিচিত তুর্কি রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সাংবাদিক মোস্তফা আকিউলের একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেন। ক্রিস্টা টিপেটের ভূমিকাসহ চার পর্বে এটি On Being-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এটি সেই সাক্ষাৎকারের পরিমার্জিত অনুবাদ।

সাথে কথা বলেছি। তিনি নিজেকে একজন স্বাধীন চিন্তার মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেন। 'নয়া তুরস্কে' গণতন্ত্র ও ধর্মীয় চেতনার সম্পর্ক নিয়ে তিনি সাক্ষাৎকারে তাঁর বোঝাপড়া তুলে ধরেন।

মোন্তফা আকিউল তুর্কি ও ইংরেজি ভাষার বিভিন্ন জার্নালে লেখালেখি করেন।
পাশ্চাত্যেও এগুলো ছাপা হয়। তাঁর জন্ম ১৯৭২ সালে। তখন তুরস্কে রাজনৈতিক
অস্থিতিশীলতা চলছিল, তৃতীয় সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যার সমাপ্তি ঘটে। বিংশ
শতকের মাঝামাঝিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে আরো দুই বার সামরিক
অভ্যুত্থান ঘটেছিল। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে সংঘটিত তুরস্কের পরিবর্তনগুলো
মোন্তফা আকিউলের জীবনের গল্পগুলোর মাঝে ধরা পড়ে। তাঁর ছিলেন দাদা ধার্মিক
মুসলিম। তবে কৈশোরে তিনি তাঁর বাবাকে দেখেছেন আতাতুর্কের সেকুলার
আদর্শের সমর্থক হিসেবে। বাবা ছিলেন সাংবাদিক। জনাব আকিউল নিজেকে
একাধারে বর্তমান ধার্মিক প্রধানমন্ত্রী এরদোয়ানের সমর্থক ও সমালোচক মনে

ক্রিস্টা টিপেট: আপনি জানেন, এক সময় গোটা মধ্যপ্রাচ্য উসমানীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। আমরা আজকে যে জায়গাটায় বসে কথা বলছি সেটা ছিল এই সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র। তো মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান অবস্থাকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

মোস্তফা আকিউল: আমি মনে করি মধ্যপ্রাচ্যে উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রভাব এখনো রয়েছে।

**ক্রিস্টা টিপেট:** অবশ্যই, এ অঞ্চলে উসমানীয় সাম্রাজ্য এখনো তাৎপর্য বহন করে।

মোন্তফা আকিউল: আমরা যে অঞ্চলকে এখন মধ্যপ্রাচ্য বলছি, সেটা বিংশ শতক পর্যন্ত উসমানীয় সাম্রাজ্য হিসেবেই পরিচিত ছিল। একজন তুর্কি হিসেবে কথাটা আমি অহংকারবশত বা জাতীয়তাবাদী মূল্যবোধ থেকে বলিনি। বলেছি এই অঞ্চলের সংস্কার, গণতন্ত্র এবং পটপরিবর্তনের ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে। দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত উসমানীয় সাম্রাজ্য আধুনিকায়নের ধারায় নিজেকে উন্নীত করার চেষ্টা করেছে। উসমানীয় শাসকদের আধুনিকায়নের এই চিন্তাভাবনা ও পদক্ষেপ নিয়ে এখানে কিংবা পশ্চিমে— কোথাও খব একটা আলোচনা হয় না।

পতন মুহূর্তেও এই সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা মধ্যযুগের অন্যসব রাজতন্ত্রের মতো ছিল না। বলা যায়, এটি ছিল এক ধরনের সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। এখানে আইনসভা ছিল। ছিল এর নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ। শুধু কি তাই? ইহুদী এবং খ্রিষ্টান ধর্মের অনুসারীদেরও আইনসভার সদস্য হওয়ার সুযোগ ছিল। সেই আইনসভায় প্রণীত আইনগুলোতে নারীদের সমান অধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হতো। উসমানীয় সামাজ্যে খ্রিষ্টান এবং ইহুদীরা অন্য সবার মতো একই রকম নাগরিক মযার্দা ভোগ করতো, যা এখন পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো দেশে নেই। অভিজাত শ্রেণী, প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ এবং আলেমদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ করা হতো।

ইসলাম ও গণতন্ত্রের কথাই ধরুন। এ দুটোর মধ্যে সমন্বয় হতে পারে কি পারে না— তা নিয়ে এখন নতুন করে বির্তক হচ্ছে। অথচ একবিংশ শতকের প্রথম থেকেই উসমানীয় গবেষকরা এসব নিয়ে আলোচনা করতেন। উসমানীয় বুদ্ধিজীবী নামিক কামাল (Namik Kemal) বলেছিলেন, আদতে গণতন্ত্র ইসলামের পরামর্শের ধারণার (শূরা) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। স্বাধীনতা ও মুক্তির পশ্চিমা মূলনীতি এবং ব্যক্তি অধিকারের মতো ধারণাগুলো মূলত আমাদের জীবনব্যবস্থার শেকড় থেকেই উঠে এসেছে।

ক্রিস্টা টিপেট: এখানে ব্যক্তির দায়-দায়িত্বের উপর কতটুকু গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে? এবং তা গণতন্ত্রের আদর্শের সাথে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ?

মোস্তফা আকিউল: একথা স্বীকার করতে হবে, রাজনৈতিক উদারতার ভিত্তি যেখানে দুর্বল সেখানে গণতন্ত্রের অবস্থা খুবই নাজুক। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্রায়নের নামে যা হচ্ছে তা অনেকটা উপর থেকে চাপানো। একে উদার গণতন্ত্র না বলে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র বলা যেতে পারে। এ অবস্থায় সেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতার চর্চা বিপজ্জনক। এ সমস্যাটা তুরস্কেও কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। এমনকি আমি নিশ্চিত বলতে পারি, এই সমস্যা তিউনিশিয়া এবং মিশরেও বিদ্যমান।

অথচ উনিশ শতকের শেষদিকে উসমানীয় খেলাফত 'তানজিমাত' নামে আধুনিকায়ন কর্মসূচি শুরু করেছিল। সে সময় খেলাফত ছিল পুরো পৃথিবীতে একমাত্র সর্বোচ্চ ইসলামী কর্তৃপক্ষ বা সরকার ব্যবস্থা। ওই সময়ে তারা সত্যিই কিছু পশ্চিমা উদার ধ্যান-ধারণা গ্রহণের চেষ্টা করছিল। এসবের সাথে পশ্চিম থেকে ফ্যাসিজম ও একদলীয় শাসনের মতো কিছু বাজে আদর্শও এ অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করেছে। যেমন সিরিয়ায় এই নেতিবাচক ব্যবস্থা এখনো প্রভাব বিস্তার করে আছে। তাই বলা যাবে না যে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে আসা সবগুলো আদর্শই ভালো। অবশ্য, উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা পশ্চিমা আধুনিকতার তুলনামূলক ভালো দিক। আমি মনে করি, উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের শুরুর দিকে উসমানীয়দের চলমান আধুনিকায়ন প্রচেষ্টা খুবই শুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারা খুব ভালোভাবেই আধুনিকায়নের সাথে ছন্দ মেলাতে সচেষ্ট ছিল। তাই বলা যেতে পারে, গণতন্ত্রের চেতনা এ অঞ্চলের জন্য নতুন কিছু নয়।

**ক্রিস্টা টিপেট:** আপনার এ কথার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এসেছে।

মোস্তফা আকিউল: হ্যাঁ, কিছুটা তো বটেই। এছাড়া আমি উনিশ শতকের উসমানীয় আমলে সংস্কারের ব্যাপারটাও উল্লেখ করতে চাই। যেমন ধর্মত্যাগের কথাই ধরুন। এটা অনেকটা এক ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করার মতো। ক্লাসিক্যাল ইসলামী আইনে ধর্মত্যাগকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদিও আমি মনে করি, এর উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিত নয়। তবে আপনি যদি বিষয়টার গোড়ায় যান তাহলে দেখবেন, ধর্মত্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল মূলত রাজনৈতিক কারণে। সে সময় স্বপক্ষের কেউ ধর্মত্যাগ করার অর্থ ছিল যুদ্ধের মাঠে প্রতিপক্ষের দল ভারী করা।

দৃশ্যত উসমানীয় শাসকরা বাস্তবতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই ধর্মত্যাগকে ব্যক্তির ইচ্ছাধীন করে দেয়া হয়েছিল। পরিবেশটা এমন করে দেয়া হয়েছিল যে কোনো মুসলিম ইচ্ছে করলে খ্রিষ্টান ধর্মও গ্রহণ করতে পারতো। এমনকি খোলাখুলিভাবে নাস্তিকতার চর্চাও করতে পারতো। সে সময় অনেকেই ছিল ইউরোপের বস্তবাদী চিন্তাবিদদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত। কই, এ জন্য তো উসমানীয় সাম্রাজ্যের আলেমগণ শিরক্ছেদ বা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার ফতোয়া দেননি! বরং তাঁরা বস্তবাদী দর্শনের গঠনমূলক সমালোচনা করে বই লিখেছেন। পাশাপাশি ইসলামী দর্শনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

আমি মনে করি, মধ্যপ্রাচ্যের জন্য আসলে কী ধরনের ব্যবস্থা দরকার তা নিয়ে উন্মুক্ত আলাপ-আলোচনা হওয়া জরুরি। যারা মনে করেন এ অঞ্চলের লোকজন উদারতা ও মুক্তচিন্তার ধারা সম্পর্কে অজ্ঞ, তারা আসলে ভুলের মধ্যে আছেন। এখানে আগে থেকেই উদারতাবাদের একটা ধারা ছিল। তবে এটাও সত্য, রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কর্তৃত্বাদী এবং স্বৈরশাসনের ধারাও ছিল। এ অঞ্চলের মানুষ শত শত বছর ধরে এসবের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।

কিস্টা টিপেট: আপনি আধুনিক তুরস্ক বলতে কী বুঝেন? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক সেকুলার আদর্শে যে তুরস্ক গড়ে তুলেছেন, সেটাকে কীভাবে দেখেন? আপনি তো এগুলোর মধ্যেই বেড়ে উঠেছেন। আমি আসলে আতাতুর্ক সম্পর্কে জানতে খুবই আগ্রহী। কারণ, গত দুদিন এখানে থেকে বুঝতে পেরেছি, আতাতুর্ক এখনো একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

মোস্তফা আকিউল: হ্যাঁ, বলা যায় একেবারে পূজনীয় ব্যক্তিত্ব।

**ক্রিস্টা টিপেট:** তাহলে আতাতুর্ক এবং তুর্কি পরিচয় নিয়ে আপনার অভিমত কী? এক্ষেত্রে কোনটাকে সেকুগুলার বলা চলে? মোস্তফা আকিউল: চমৎকার প্রশ্ন। আমার মনে হয়, আসলে সেক্যুলারিজমকে এখানে অতি মূল্যায়ন করা হয়েছে। সেক্যুলারিজমকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে মনে হবে, সেক্যুলারিজমের কাজ হলো পাবলিক স্পেস থেকে ধর্মকে নির্মূল করা। ফ্রান্সে যেমনটা চর্চা করা হয়। কিন্তু এখানে সেভাবে সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হলে গণতন্ত্র এবং উদারতাবাদ টিকবে না।

সেকুগলার স্বৈরশাসকদের যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়ার অভিজ্ঞতা এ অঞ্চলের রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আপনি উসমানীয় সামাজ্যের শেষ আমলের সাথে সেকুগলার প্রজাতান্ত্রিক তুরন্ধের তুলনা করতে পারেন। এতে দেখা যায়, সেকুগলার প্রজাতান্ত্রিক তুরন্ধের একজন খ্রিষ্টানের চেয়ে উসমানীয় সামাজ্যের একজন খ্রিষ্টান বেশি স্বাধীনতা ভোগ করেছে। এই পার্থক্যের কারণটা হলো, আমদানি করা সেকুগলারিজমের সাথে জাতীয়তাবাদের নেতিবাচক দিকগুলো ঢুকে পড়েছে। ফলে এমন এক শাসনব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে, যে ব্যবস্থা আহলে কিতাব (ইহুদী ও খ্রিষ্টান) ও অন্যান্য ভিন্নধর্মীর ব্যাপারে ক্লাসিক্যাল ইসলামী আদর্শের তুলনায় অনেক বেশি অসহিঞ্চ।

ধরুন, নীতিগতভাবে আমি সেক্যুলার রাষ্ট্রে বিশ্বাস করি। আমি মনে করি, রাষ্ট্রের ধর্মীয় পরিচয় না থাকাটা ভালো চিন্তা। কিন্তু ধর্ম বাদ দিলেও রাষ্ট্রের যদি অন্য কোনো মতাদর্শিক পরিচয় থাকে, তাহলে সেটা তো আরো খারাপ। যেমন: স্নায়ুযুদ্ধের সময় আমরা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ দেখেছি, কিংবা ফ্যাসিবাদ। এই উদাহরণগুলো তো আরো বাজে।

**ক্রিস্টা টিপেট:** আপনার পরিবারে ধর্মের চর্চাটা কেমন? যতটুকু পড়েছি, আপনার দাদা ছিলেন...

মোন্তফা আকিউল: আমার দাদা-দাদী দুজনই ধার্মিক মুসলিম ছিলেন। আমার মনে আছে, ইসলামের প্রথম শিক্ষাটা তাঁদের কাছ থেকেই পেয়েছি। দাদা আমাকে ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো শিথিয়েছিলেন। শুরুটা বেশ নাটকীয় ছিল। তখন আমার বয়স ছিল ৯ বছর। একদিন দাদার লাইব্রেরিতে একটি বই খুঁজে পাই। কোরআন নয়, সেটা ছিল একটা পুরোনো ইসলামী বই। বইটাতে মানুষের সন্তা, জীবন, সৃষ্টিরহস্য— এসব বিষয়ে আলোচনা ছিল। প্রতিটি বিষয়ের সাথে ছিল শিহরণ জাগানো কোরআনের বাণী। এক জায়গায় গিয়ে আমি থমকে যাই, সেখানে বলা ছিল অনেকটা এরকম, "তোমার সন্তান যদি ১০ বছর বয়স থেকে নামায পড়া শুরু না করে, তাহলে তাকে প্রহার করো।" সম্ভবত তখন থেকেই ইসলামী আইন এবং ঐতিহ্যের কর্তৃত্ববাদী বিষয়গুলোর সাথে আমার পরিচয় ঘটে। আমার মধ্যে দ্বিধাদন্দ্ব শুরু হয়। বিশ্বাসী মুসলিম হয়েও কীভাবে আমরা ইসলামের কর্তৃত্ববাদী আইনগুলোতে পরিবর্তন আনতে পারি— এসব নিয়ে আমার চিন্তাভাবনা শুরু হয়।

আমার মা-বাবা ধর্ম মোটামুটি পালন করতেন। আসলে সময়টাও ছিল তেমন। ধর্ম পালনের বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তবুও আমি তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। বিশেষত বাবার কাছ থেকে। তাঁর অবস্থান ছিল সবসময় স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে। ১৯৮০ সালে সামরিক জান্তা সরকার যখন রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের জেলে পুরছিল তখন বাবাও নির্যাতনের শিকার হন। সে সময় প্রায় ৬ লক্ষ মানুষ জান্তা সরকার দ্বারা গ্রেফতার ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। মনে আছে, আমার বয়স তখন ছিল আট। বাবাকে দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম বাবা মিলিটারি ব্যারাকের অসংখ্য কাঁটাতারের ভেতর বন্দি। এটা দেখতে ঠিক সোভিয়েত ইউনিয়নের 'গুলাগ' কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মতোই ছিল।

## <u>দ্বিতীয় পর্ব</u>

[আজ আমরা এসেছি ইস্তাম্বল শহরে। ধর্ম এবং গণতন্ত্রের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা উদীয়মান তুর্কি মডেলকে এগিয়ে নেয়ার পেছনে কোন বিষয়গুলো কাজ করছে, সেসব निरार कथा वर्नाष्ट्र भारतिका व्यक्तिप्रतिन प्रार्थ। २००२ भारति धत्रपारातिन মতো ধার্মিক মুসলিম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় অনেকেই নাখোশ হয়েছিলেন। পশ্চিমা এবং তুর্কি রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এ দেশের রাজনীতিতে 'ইসলামিজম' অনুপ্রবেশের আশঙ্কার কথা প্রচার করে ভীতি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবে বর্তমান আধুনিক তুরক্ষে এক অভিনব পরিস্থিতি বিরাজ করছে। একদিকে রয়েছে আতাতুর্কের সেক্যুলার সংস্কৃতি, অন্যদিকে এরদোয়ান প্রবর্তিত ধর্মীয় স্বাধীনতা। कछेत रमकुनातिषासत প্रভाবেत मरधा धर्मीय स्वाधीनका ठर्जात भतिरवन रेवित करतरहन এরদোয়ান। তুমুল জনপ্রিয়তার কারণে টানা তিন বার সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ करतिष्ट्रन जिनि। त्म रित्मति जुतस्कृत ইতিহাসে এतদোয়াन मीर्घ समग्र धरत क्रमजाग्र थाका এकমাত্র নেতা। অথচ একটা সময় ছিল যখন তুরস্কে আতার্তুকের কট্টর সেকু)नातिজমের উত্তরসূরী শাসকরা জনসম্মুখে সব ধরনের ধর্মীয় আচার নিষিদ্ধ করেছিল। তখনকার বিতর্কিত আইনের কারণে ধার্মিক মুসলিম নারীরা বাধ্য হয়ে স্কার্ফের উপর পরচুলা লাগিয়ে রাস্তায় বের হতেন। আজ সে বিতর্কের স্রোত উল্টো দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী নিজেই এখন হেডস্কার্ফ পরিধান করেন।

কিস্টা টিপেট: আপনার মতে, তুরক্ষে সেকুগুলারিজম ছিল শুধু সরকারী পর্যায়ে। আর এটা ছিল ধর্মীয় আওতা থেকে পুরোপুরি মুক্ত সেকুগুলারিজমের ফ্রেঞ্চ মডেল। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের সেকুগুলারিজমের মানে হলো চার্চ এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের পৃথকীকরণ ব্যবস্থা, যেখানে ধর্মগুলো থাকবে স্বাধীনভাবে। আমেরিকান এই মডেলটি এখানে গৃহীত হয়নি। মোস্তফা আকিউল: আমি মনে করি, বিংশ শতকটা ছিল মুসলিম বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম জনপদগুলো কখনো যুক্তরাষ্ট্রের মতো উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চর্চা করার সুযোগ পায়নি। উল্টো তারা তথাকথিত আধুনিক সেকুগুলারিজমের ছদ্মবেশী স্বৈরশাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে এসেছে। যেমন তুরস্কে কামালবাদী সেকুগুলারিজম, মিশরে নাসের এবং মুবারকের একনায়কতন্ত্র, তিউনিশিয়ায় বেন আলীর মতো স্বৈরশাসকরা শাসন করেছে শতান্দীর অধিকাংশ সময় ধরে। যার ফলে মানুষের মনে জন্ম নিয়েছে ক্ষোভ আর হতাশা। স্বৈরশাসনের বিকল্প প্লাটফর্ম হিসেবে গড়ে উঠেছে কট্টর ইসলামপন্থা। টিকে থাকার জন্য তারা চরমপন্থা অবলম্বন করেছে। ফলে মধ্যপ্রাচ্য কর্তৃত্বাদী সেকুগুলারিস্ট ও কর্তৃত্বাদী ইসলামপন্থীদের মাঝখানে আটকে ছিল। উভয়পক্ষের কট্টরবাদিতার কারণে বহুত্বাদ আর উদার গণতান্ত্রিক রাজনীতির মতো মধ্যপন্থী ব্যবস্থা চর্চা করার সুযোগ এ অঞ্চলের মানুষ খুব একটা পায়নি।

ইতোমধ্যে আরব বসন্তের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের দাবি উঠছে। দেখে সত্যি ভালো লাগছে। এটাকে আমি উদার গণতন্ত্রের আকস্মিক উত্থান বলবো না। তবে বলা যায়, এটি মুসলিম বিশ্বের জন্য রাজনৈতিক উদারতাবাদের প্রথম উষালগ্ন। আমাদের ভাগ্য ভালো যে ১৯৫০ সালে প্রথমবারের মতো একটা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছিল। তথন থেকে তুর্কি জনগণ একটা কার্যকরী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পেয়েছে। যদিও অনেক ক্রটিবিচ্যুতি আছে, সামরিক হস্তক্ষেপ ছিল; তারপরও উদারপন্থী আইন ও বাকস্বাধীনতা বিদ্যমান রয়েছে। তুরক্ষে আমরা এই কারণে ভাগ্যবান। আরবরা তা থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। তারা একদলীয় শাসনের অধীন ছিল। অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের তুলনায় বহুদলীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরীক্ষাননিরীক্ষার সুযোগ আমাদের অনেক বেশি ছিল। মিশর মাত্র মাস ছয়েক ধরে এটা শুরুক করেছে।

**ক্রিস্টা টিপেট:** মিশরের জন্য একেবারেই প্রাথমিক অবস্থা বলা যায়।

মোস্তফা আকিউল: হ্যাঁ, মিশরীয়দের জন্য এটা নতুন অভিজ্ঞতা।

ক্রিস্টা টিপেট: আমার মনে হয়, আপনার বাবা-মায়ের চেয়ে আপনি অনেক বেশি ধার্মিক। নাকি শুধু পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণেই ইসলামের প্রতি আপনার সহানুভূতি কাজ করছে?

মোস্তফা আকিউল: ইসলামের তাত্ত্বিক বিষয়গুলো বাবা-মায়ের তুলনায় আমাকে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিয়ের আগে তাঁরা প্রেম করেননি। ২২ বছর বয়সে তাঁরা বিয়ে করেছেন। অবশ্য সামাজিক জীবনে আমি তাঁদের চেয়ে আরো

বেশি উদার মনোভাব পোষণ করি। বর্তমান সময়টা হলো বিশ্বায়নের। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে আমাকে নানা জায়গায় দোঁড়াতে হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের নানা ধরনের বন্ধু-বান্ধবের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয় সবসময়। এরকম আরো কত কিছুর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হচ্ছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ক্রিস্টা টিপেট: কখন থেকে ইসলামী ধর্মতত্ত্ব আপনাকে অনুপ্রাণিত করে?

মোস্তফা আকিউল: যখন আপনি পরিবারের সাথে থাকবেন, তখন আপনার বেড়ে ওঠা, আপনার পরিবার, সংস্কৃতি, পরিপার্শ্ব— এসব দ্বারাই আপনার পরিচয় নির্ধারিত হবে। যেমনটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছে। আমার মনে মাঝেমধ্যেই নানা প্রশ্ন উঁকিঝুকি দিত। আমাদের পরিচয় কী, জীবন চলার সঠিক পথ কোনটি, জীবনের উদ্দেশ্য কী— এ প্রশ্নগুলো নিয়ে আমি খুব ভাবতাম। হাইস্কুলের শেষ বছর নুরসীর ধর্মীয় আন্দোলনের সাথে আমার সাথে পরিচয় ঘটে। এ আন্দোলনটা গড়ে উঠেছিল মূলত বিদিউজ্জামান সাঈদ নুরসীর বইয়ের পাঠকদের মাধ্যমে। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেম। ১৯৬০ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। আমি তাঁদের শিক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছি। তখন থেকে ব্যক্তিগত জীবনে আমি ধার্মিক হয়ে উঠি।

সময়ের পরিক্রমায় সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি কোনো নির্দিষ্ট মাজহাব বা সম্প্রদায়ের অনুসারী হবো না। এ জন্য নিজেকে একজন স্বাধীন চিন্তার মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইসলামের মৌলিক বিষয়ের উপর আমার ঈমান ও আস্থা অবিচল আছে এবং তা আজীবন অটট থাকবে।

ক্রিস্টা টিপেট: আমি যুক্তরাষ্ট্র ও তুরস্কের মধ্যে একটা তুলনা করে থাকি। যদিও এটা খুব জুতসই নয়, তারপরও এ সম্পর্কে কথা বলার জন্য এটা কিছুটা কার্যকরী। আবারো বলছি, সবকিছুই আপেক্ষিক এবং দেশ দুটির পরিস্থিতিও একদম আলাদা। যাইহোক, তুলনাটা এমন— বিশ শতকের শেষাংশে যুক্তরাষ্ট্র একটা সেকুলার কাল পার করে এসেছে, তখন এলিট শ্রেণী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সেকুলারে পরিণত হয়েছিল। এমনকি সরকার এবং কর্মক্ষেত্রগুলোকে পর্যন্ত সেকুলার হিসেবে গড়ে তোলার তোড়জোর চলছিল। কিন্তু সত্য কথা হলো, সাধারণ মানুষ তখনো ধার্মিক থেকে গিয়েছিল। আপনি নিশ্চয় জেনে থাকবেন, নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ধর্ম দিন দিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রসার লাভ করছে। বিশ্বয়ের ব্যাপার হলো, তুরক্ষেও ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটেছে! এক সময় তুরক্ষেও সেকুলার শাসন ছিল এবং সরকারীভাবে সেকুলার সংস্কৃতি ছিল। কিন্তু এখনকার মতো তখনো মানুষ ইসলামের অনুসারী ছিল। আপনি নিজেই এর চমৎকার দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন।

মোস্তফা আকিউল: আস্তিক ও ধর্ম পালনকারী মানুষ বিবেচনায় তুরস্ক ও যুক্তরাষ্ট্রের

সমাজে বেশ মিল রয়েছে। প্রখ্যাত মার্কিন সমাজতত্ত্ববিদ পিটার বার্গার একবার বলেছিলেন, "যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে এলিট সুইডিশদের দ্বারা শাসিত একটি ভারতীয় দেশ।" অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষেরা ভারতীয়দের মতো ধর্মজীরু, তবে তাদের শাসন ব্যবস্থা সুইডেনের মতো সেকুলার। আমি বার্গারের উক্তিকে তুরক্ষের প্রেক্ষাপটে এভাবে বলতে আগ্রহী, "তুরক্ষ হচ্ছে একদল উত্তর কোরিয়ান দ্বারা শাসিত একটি ভারতীয় দেশ।" অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি, সুইডিশরা অন্তত উদার প্রকৃতির। কিন্তু কোরিয়ান শাসকদের রীতিমতো পূজা করতে হয়, তারা কট্টর স্বৈরশাসক। তুরক্ষেও সাম্প্রতিক অতীতে এমন অবস্থা ছিল।

তো, প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের সময়ে আমেরিকার হৎপিণ্ড বলে পরিচিত অভিজাত নিউইয়র্ক, সানফ্রান্সিসকোর মতো শহরগুলোতে খ্রিষ্টান ডানপন্থীদের উত্থান ঘটে। তারা সেক্যুলার আমেরিকানদের চ্যালেঞ্জ করা শুরু করে। তুরক্ষেও অনেকটা একইভাবে ইসলামী শক্তির উত্থান ঘটেছিল।

অবশ্য তুরক্ষের ইসলামপস্থীদের উত্থান ইরানের মতো হয়নি। সে রকম হলে তো বাজে একটা ব্যাপার হতো। আপনি নিশ্চয় জানেন, ইরানে এক স্বৈরশাসকের কাছ থেকে আরেক স্বৈরশাসকের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে মাত্র। সেখানে আগের মতোই এখনো স্বৈরশাসন বলবৎ রয়েছে। রেজা শাহ হেডস্কার্ফকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। তারপর খোমেনী এসে বললেন, এখন থেকে সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে হেডস্কার্ফ পরতে হবে; কারণ, এটা তাঁর আইন। তুরক্ষে যে এমনটা ঘটেনি এ জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ। আমাদের গণতন্ত্র চর্চার অভিজ্ঞতার ফলেই হয়তো ইসলামপন্থীরা ধীরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একীভূত হচ্ছে। যদিও সেকুগুলারদের বিবেচনায় তারা এখনো বেশ রক্ষণশীল রয়ে গেছে।

গর্ভপাত নিয়ে এরদোয়ান সম্প্রতি যে নয়া সাংস্কৃতিক যুদ্ধ শুরু করেছেন, রক্ষণশীলতার উদাহরণ হিসেবে এটি উল্লেখযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশেও গর্ভপাত নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তুরক্ষে অন্তত একথা কেউ বলবে না যে গর্ভপাতের কারণে কোনো নারীকে পাথর নিক্ষেপ করা হোক। গর্ভপাতের ব্যাপারে ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকবে নাকি থাকবে না— এটা হলো মূল বিষয়। আমি মনে করি, এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা থাকা উচিং। তবে কোনো স্বাধীন ও মুক্ত সমাজেই এসব বিষয় বিতর্কমুক্ত থাকে না।

#### **ক্রিস্টা টিপেট:** তা অবশ্য ঠিক।

মোস্তফা আকিউল: মধ্যপ্রাচ্যে আধুনিকতার বিকাশ বারবার বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণ হলো এ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা। এ অঞ্চলের মুসলিমদের ধারণা হলো, আধুনিক হতে চাইলে নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস বাদ দিতে হবে, সমাজকে ধর্মমুক্ত করতে হবে, অনেক বেশি সেকুগলার হতে হবে ইত্যাদি। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র একটা গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। আমার এক রক্ষণশীল মুসলিম বন্ধু কিছুদিনের জন্য আমস্টারডাম গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, "আমরা সেখানকার মানুষগুলোর মতো হতে চাই না। কারণ, তারা খুব বেশি সেকুগলার। যদিও আমি তাদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ করি।" সেই বন্ধুর কথা শুনে বুঝতে পারলাম, পশ্চিমা জনগণ এতটাই সেকুগলার যে এ অঞ্চলের ধর্মবিশ্বাসী মানুষগুলো তাদের মতো করে আধুনিক হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে না।

তবে আমি মনে করি, পশ্চিমাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ব্যতিক্রমী উদাহরণ। ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান সমাজ সেখানে রয়েছে। একই সাথে তারা খুবই উদার ও চিন্তাধারায় আধুনিক প্রকৃতির। এর ফলে সেখানে ধর্ম ও আধুনিকতা নিয়ে যে কোনো ধরনের মুক্ত আলোচনা চলতে পারে। তাই আমি বিশ্বাস করি, আধুনিকতাকে গ্রহণ করার জন্য এ অঞ্চলের মানুষের কাছে যুক্তরাষ্ট্র তুলনামূলক ভালো উদাহরণ হতে পারে।

**ক্রিস্টা টিপেট:** তুরস্ক ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেবে নাকি দেবে না, তা নিয়ে গত ১০ বছর ধরে প্রচুর মাতামাতি হচ্ছে। অথচ তুরস্ক এখন এমন একটা পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে ইইউতে যোগ দেয়ার বিষয়টা আর তেমন গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হচ্ছে না।

মানচিত্রে তুরস্কের অবস্থানটা দেখলে মনে হয়, তুরস্ক বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। সবখানেই পরিবর্তন ঘটছে, তাই না? মিশর ও তিউনিশিয়ায় নিকট ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে কে জানে! তবে ইতোমধ্যে এসব দেশে পরিবর্তন শুরু হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইউরোপেও এই পরিবর্তনের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। আর এই সমস্ত রূপান্তরের কেন্দ্রে রয়েছে তুরস্ক। একজন তুর্কি হিসেবে এসব নিয়ে আপনি কী ভাবছেন?

মোন্তফা আকিউল: হ্যাঁ, সেটাই। একজন তুর্কি নাগরিক হিসেবে এ জন্য আমি অত্যন্ত গর্বিত। এর আগে এমন গর্ব করার সুযোগ হয়নি। তবে তুরক্ষের সব ব্যাপার নিয়ে আমি সন্তুষ্ট নই। বাকস্বাধীনতার প্রশ্ন তো আছেই। এছাড়াও আমাদের অনেক সমস্যা রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা বাদই দিলাম, আমরা এখনো সংখ্যালঘুদের সমস্যার সমাধানই করতে পারিনি। বলা যায়, আমাদের দেশে গণতন্ত্র চর্চায় এখনো অনেক ভুলভ্রান্তি রয়ে গেছে। সকল সমস্যা একদিন অলৌকিকভাবে সমাধান হয়ে যাবে বলে যারা মনে করেন, আমি তাদের সাথে একমত নই।

ক্রিস্টা টিপেট: এসব ভুলভ্রান্তি অতিক্রম করেই তো গণতন্ত্রের ভিত্তিটা মজবুত হবে। তাই না? মোস্তফা আকিউল: আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংস্কার কাজ হয়েছে। এবং সত্য কথা হলো, অনেক সংস্কার ইসলামপন্থীদের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এটি ভালো উদাহরণ। ইতিবাচক একটি বিষয়। কিন্তু আমরা আসলে একটি জটিল সন্ধিক্ষণে রয়েছি। যেমন: মাত্র আজকেই এরদোয়ান ঘোষণা দিয়েছেন যে তুর্কি স্কুলগুলোতে এখন থেকে কুর্দি ভাষায়ও ক্লাস করা যাবে। এটি অত্যন্ত ইতিবাচক একটি পদক্ষেপ। কিন্তু দুদিন আগেও তিনি এমন কিছু করেছেন, যা ছিলো উদার দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ, এরদোয়ানের শাসনব্যবস্থার ভালোমন্দ দুটি দিকই রয়েছে। জানি না, শেষ পর্যন্ত কোন দিকটি বিজয়ী হবে। তারমানে, আমাদের কিছু সমস্যা আছে।

ক্রিস্টা টিপেট: এভাবে বলাটা মনে হয় ঠিক হচ্ছে না। আমেরিকান রাজনীতিবিদরাও কিন্তু একদম এমনই। (হাসি)

মোস্তফা আকিউল: একবিংশ শতকের সূচনালগ্নে তুরস্কে যে জাগরণ শুরু হয়েছে, তার উৎস খুঁজতে হলে তুরস্কের ইতিহাসকে আগে বিবেচনায় নিতে হবে। বর্তমানে তুরস্ক তার ঐতিহাসিক পরিচয় এবং উসমানীয় ঐতিহ্যকে ধারণ করতে শুরু করেছে। এতেই তারা উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রেরণা খুঁজে পেতে চাচ্ছে।

তারমানে আমরা আবারো সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি, তা নয়। যেমনটা অনেকে মনে করেন যে তুরস্ক পাশ্চাত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে পুরোপুরি প্রাচ্য অভিমুখী হচ্ছে। আসলে তা নয়। বরং তুরস্ক দিন দিন উদার হচ্ছে। এক সময় এ অঞ্চলের সবার সাথে তুরস্কের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। সেই আস্থার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে তুরস্ক কাজ করছে। এর পেছনে যে বিষয়টি প্রেরণা যোগাচ্ছে তা হলো 'মুসলিম পরিচয়'। মাঝখানে কিছু সময় মুসলিম পরিচয়ের কারণে তুরস্কের মানুষ দমনপীড়নের শিকার হয়েছিল। কিন্তু আজকের তুরস্ক পাল্টে গেছে। এখন মুসলিম পরিচয় দিতে মানুষ গর্ববোধ করে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সফলতা আসবে তখনই, যখন আমরা তুরস্কের এই পালাবদলের সময়কে গণতান্ত্রিক কাঠামোতে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারবো এবং সেকুলার ও অমুসলিমদের প্রাপ্য অধিকারসমূহ নিশ্চিত করতে পারবো। কারণ, পাশ্চাত্য নাকি প্রাচ্য— এ ধরনের প্রান্তিক ভেদজ্ঞান নিয়ে বসে থাকার দিন আর নেই।

ক্রিস্টা টিপেট: মডেলটা একটু ভিন্ন ধরনের মনে হচ্ছে।

মোস্তফা আকিউল: হ্যাঁ। তবে এর জন্য শর্ত হলো, গণতন্ত্রকে তার নিজের সুরে বাজতে দেয়া। তুরস্ক যদি একদল জেনারেলের অধীনে শাসিত হয় এবং ধার্মিকদেরকে কোনঠাসা করে রাখা হয়, তাহলে তুরস্ক কখনোই ইসলামী গণতন্ত্রের দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠতে পারবে না। তুরস্ক তখনই সত্যিকার অর্থে ইসলামী গণতন্ত্রের উদাহরণ হয়ে উঠবে, যখন ধার্মিক জনগণ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধারণ করবে এবং তা এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। আমি মনে করি, এক্ষেত্রে আমাদের কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।

ক্রিস্টা টিপেট: এরদোয়ানের একটা কথা আমি এখানে লিখে রেখেছি। এটি অনেকটা মার্কিন রাজনীতিবিদদের কথার মতো শোনায়। সেটা হলো, "যখন আমি ঘরে থাকি তখন আমি একজন মুসলিম। আর যখন অফিসে থাকি তখন আমি গণতন্ত্রের জন্যই কাজ করি।"

মোস্তফা আকিউল: আসল কথা হচ্ছে, তুরস্ককে বিশ্বশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এবং গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে এরদোয়ান সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে চান। তুরস্কের অর্থনীতিতে গতি আনতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়া তাঁর গৃহীত উদ্যোগের অনেকগুলো ইতোমধ্যে সফলতার মুখ দেখেছে। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কতটা ইতিবাচক— সেটাই আসল প্রশ্ন। আমার মনে হয়, ক্ষমতায় টিকে থাকার আকাজ্কা তাঁর গণতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতিকে মাঝেমধ্যে স্লান করে দেয়। তাঁকে একেক সময় একেক রূপে দেখা যায়। একদিন ঘুম থেকে ওঠে হয়তো দেখবেন এরদোয়ান খুব উদারবাদী। কিন্তু দুদিন পর আবারো ঘুম থেকে ওঠে দেখবেন এরদোয়ানের মেজাজ বেশ চড়া। মনেই হবে না তিনি কোনো গণতান্ত্রিক দেশের নেতা।

কিস্টা টিপেট: এরদোয়ানের আচরণের চেয়েও বড় প্রশ্ন হলো, তুরস্কে গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশটা কীভাবে হয়েছিল? গণতান্ত্রিক পরিপক্কতা অর্জনের অভিজ্ঞতাই বা কতটুকু?

মোস্তফা আকিউল: হ্যাঁ। তবে শুধু তাই নয়। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কতটুকু সমন্বয় করতে পারছি, এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এছাড়া কীভাবে আমরা হারজিতের নেতিবাচক রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো— সে প্রশ্নও রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তুরস্কে একটা কথা প্রচলিত আছে, 'যদি আপনি হাত বাড়িয়ে দেন তাহলে পুরো হাতটাই আপনাকে হারাতে হবে।' আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টানো দরকার। তাই আমি বলতে চাই, 'আপনি যদি হাত না বাড়ান, তাহলে আপনি কখনো বন্ধুত্বই করতে পারবেন না।' আপনি যদি কিছু ইস্যুতে ছাড় না দেন, তাহলে কখনোই ঐক্যমত্যে পৌঁছতে পারবেন না। 'কুর্দি নাকি তুর্কি, ইসলামপন্থী নাকি সেকুগুলারপন্থী'— এসব বিতর্ক নিরসনে এখন পর্যন্ত আমরা কোনো ধরনের ঐক্যমত্যে আসতে পারিনি। আমি মনে করি, সেকুগুলারিজম প্রশ্নে

এবং প্রাত্যহিক জীবনের মৌলিক ব্যাপারগুলোতে আমাদের ঐক্যমতে আসতে হবে। যদিও কিছু ইস্যুতে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব বিরাজ করছে। তবে আমি মনে করি, কেউ স্বার্ফ পড়তে চাইলে তাকে সে সুযোগ দেয়া উচিং। কেউ চায় তো মিনিস্কার্টও পড়তে পারে। এই ব্যাপারটা তুরস্কের অধিকাংশ জনগণই মেনে নিয়েছে।

ক্রিস্টা টিপেট: আপনি কি এ বিষয়গুলোকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করছেন?

মোস্ককা আকিউল: অবশ্যই, সেটা তো দেখতেই পাচ্ছেন। আপনাকে আরো একটা উদাহরণ দেই। আরবদের কাছে তুরস্ক দিন দিন অর্থবহ হয়ে উঠছে। আপনি দেখতে পাবেন তুরস্কে অনেক আরব পর্যটক বেড়াতে আসে। তারা দেখছে, এখানে অনেক মসজিদ আছে এবং নামাজের সময় প্রচুর মুসল্লী সেখানে যায়। আবার অনেক মদের বারও আছে। সেখানেও প্রচুর লোক সমাগম তাদের চোখে পড়ে। আসলে এগুলো নিয়েই বর্তমান তুরস্ক। আমার ধারণা, আরবরা চায় তাদের দেশটাও এভাবেই গড়ে উঠুক।

## তৃতীয় পর্ব

্রিএতক্ষণ আমি ইস্তামুলে মোস্তফা আকিউলের বাসায় তাঁর সাথে কথা বলছিলাম। আকিউলের এ সাক্ষাৎকার থেকে তুর্কি জাতি ও এ অঞ্চলের জটিল বাস্তবতাগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। কীভাবে নবী মুহাম্মদ (সা.) তুরক্ষের নতুন প্রজন্মের কাছে প্রেরণার বাতিঘর হয়ে উঠছেন, ইসলামিক ক্যালভিনিস্ট (সংস্কারবাদী) মোস্তফা আকিউল তা বিশ্লেষণ করেছেন।

তুরক্ষে চলমান ধর্ম ও গণতন্ত্রের সমস্বিত মডেলটি নিয়ে জনাব আকিউল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন। মূলত এই বিষয়টিকে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের অন্যতম কারণ বলা যায়। ইস্তাস্থল এক সময় কনস্টান্টিনোপল নামে উসমানীয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। গ্রীক ও রোমানদের পতনের পর এই সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে। মোস্তফা আকিউলের মতো যারা 'নয়া তুরস্কের' স্বপ্ন দেখেন তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উদার সাংবিধানিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ স্বপ্পকে তারা বাস্তবে রূপে দিতে চান।

সাম্প্রতিক একটি জরিপ থেকে এ অঞ্চলে তুরস্কের প্রভাব টের পাওয়া যায়। দেখা গেছে, প্রায় ৬৩ শতাংশ মিশরীয় জনগণ তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী এরদোয়ানকে বিশ্বনেতা হিসেবে পছন্দ করেছে। সৌদি বাদশা পেয়েছেন মাত্র ৫ শতাংশ লোকের সমর্থন। বারাক ওবামাও সৌদি বাদশার সমান ভোট পেয়েছেন।] ক্রিস্টা টিপেট: প্রায় বছরখানেক আগে অর্থাৎ ২০১১ সালে ইউএস-ইসলামিক ওয়ার্ল্ড ফোরামের একটা অনুষ্ঠানে আমি যোগ দিয়েছিলাম। আপনি কি সেখানে ছিলেন?

মোস্তফা আকিউল: সপ্তাহ দুয়েক আগে আমি সেখানে ছিলাম।

ক্রিস্টা টিপেট: ইসলামিক ওয়ার্ল্ড ফোরামের অনুষ্ঠানটির ঠিক পর পর — সম্ভবত ২০১১ সালের মার্চ বা এপ্রিলের দিকে — আরব বসন্ত শুরু হয়। তারপর একের পর এক আরব দেশে দারুণভাবে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। মিশর ও তিউনিশিয়ায় আওয়াজ উঠলো, তারা তুর্কি মডেলের শাসনব্যবস্থা চায়। আন্দোলনকারীদের মতো আমিও অনুভব করলাম বিষয়টা। অনেকে তো মনে করছে এটা তুর্কিদের কারসাজি, মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের প্রভাব তৈরির প্রচেষ্টা। কিন্তু যে মডেলটা গড়ে ওঠতে তুরক্ষ দীর্ঘ সময় নিয়েছে, সেখানে আরব দেশগুলোতে হুট করে 'তুর্কি মডেল' কতটুকু কাজে লাগতে পারে? সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটিকে কীভাবে দেখছেন?

মোন্তফা আকিউল: রক্ষণশীল তুর্কিদের একটা বিশ্বাস আছে, যাকে আমি 'Turkey's Manifest Destiny' বলে থাকি। এর মূল চেতনা হলো— বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তুর্কি জাতির একটা ঐতিহাসিক মিশন আছে। তারা মনে করে, শত শত বছর ধরে ইসলামী সভ্যতার সত্যিকারের ধারক-বাহক ছিল তুর্কি জাতি। শুধু নেতৃত্বই নয়, গণতন্ত্রের সমন্বয়ে ইসলামী সভ্যতা বিনির্মাণের ক্ষেত্রেও তুর্কিরা অপ্রগামী ছিল। আমার মতে, চূড়ান্ত বিচারে গণতান্ত্রিক আদর্শের সাথে ইসলামে কিছু বিষয়ের মিল রয়েছে। তবে গণতন্ত্র আসলে আধুনিক পাশ্চাত্যেরই সৃষ্টি। উসমানীয়রা গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে, সমন্বয়ের চেষ্টা করেছে। যদি জানতে চাওয়া হয়, তুরক্ষের জন্য উল্লেখযোগ্য দিক কোনটি? উত্তরটা হবে, গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা আমাদের অনেক দিনের।

ইসলামী সভ্যতার উপাদানগুলো তুরস্ক নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারলে এবং এর পাশাপাশি আরবদের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুললে দারুণ একটা ব্যাপার হবে। আপনি জানেন, তুরস্কের থিক্ক ট্যাক্কগুলো এখন কায়রোতে তাদের ব্যুরো অফিসখুলছে। শুধু তাই নয়, তুরস্ক পশ্চিমাদের সাথেও একত্রে কাজ করছে। মধ্যপ্রাচ্যের জটিল রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে সংলাপের আয়োজন করেছে। ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক আলোচনার মধ্যস্থতাকারী হচ্ছে তুরস্ক।

**ক্রিস্টা টিপেট:** মধ্যপ্রাচ্যের সাথে ইউরোপের সেতুবন্ধন তৈরিতেও তুরস্ক কাজ করছে বলা যায়।

মোস্তফা আকিউল: ঠিক বলেছেন। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে এই ধারা অব্যাহত রাখতে পারলে তুরস্ক অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু বৃদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে তুরস্ক এখনো যথেষ্ট পিছিয়ে আছে। যেমন, তুরস্কে খুব কম লোকই আরবীতে কথা বলতে পারে। কারণ, আমরা আরব বিশ্ব থেকে এক রকম বিচ্ছিন্ন বলা যায়। আমরা যেমন আরবীতে কথা বলি না, তেমনি আরবরা তুর্কি ভাষায় কথা বলে না। আরবীর সাথে তুর্কি ভাষার পার্থক্য অনেক বেশি।

**ক্রিস্টা টিপেট:** হুম, ঠিক।

মোস্তফা আকিউল: অটোমান তুর্কি ভাষা লেখা হতো আরবী বর্ণমালায়। তখন প্রচুর আরবী শব্দ ছিল। তবে তুর্কি ব্যাকরণই অনুসরণ করা হতো। তুর্কি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর এই বর্ণমালা পাল্টে ফেলা হয়। এমনকি তুর্কি ভাষাকে বিশুদ্ধ রাখার অযুহাতে আরবী ও ফার্সি শব্দগুলো ছেঁটে ফেলা হয়।

ক্রিস্টা টিপেট: জানতাম না তো!

মোস্তফা আকিউল: এটাকে তখন ভাষা বিপ্লব হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল। কাজটা আমার কাছে এক ধরনের বর্বরতা বলেই মনে হয়েছে। এর ফলে তুর্কি শব্দভাগুর সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। পরে নব্য শাসকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত Turkish Language Institution কৃত্রিম শব্দ দিয়ে নতুন অভিধান তৈরি করে।

ক্রিস্টা টিপেট: কাজগুলো আতাতুর্কের আমলে হয়েছিল?

মোস্তফা আকিউল: হ্যাঁ, আতাতুর্কের আমলেই হয়েছিল। তুরক্ষের সংস্কৃতিকে আরবী ও ফার্সির প্রভাব থেকে মুক্ত করতে এসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। আশ্বর্যজনকভাবে অনেকেই সে সময় তুর্কি ভাষার উপর এমন নৃশংস পদক্ষেপকে ইতিবাচক হিসেবে দেখে থাকেন। কিন্তু আমি মনে করি, এটা আমাদের সাহিত্য, এমনকি চিন্তা-চেতনায়ও অবক্ষয় তৈরি করেছে। আমরা তুর্কি ভাষার দ্যোতনা হারিয়ে ফেলেছি। শুধু তাই নয়, বর্ণমালা ও শব্দভাগুরে এত বড় পরিবর্তনের ফলে অধিকাংশ মানুষ তখন রাতারাতি অক্ষরজ্ঞানহীন ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন! এক সময় বাপদাদারা কী লিখে রেখে গিয়েছে, সেগুলো বুঝার সাধ্য আর নেই এখনকার নাতিপুতিদের। এভাবে তুর্কিদের সাথে আরবদের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে একটা অদৃশ্য দেয়াল তৈরি করা হয়েছে। অবশ্য নয়া তুর্কি শাসক ও শিক্ষিত সমাজ এসব চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

**ক্রিস্টা টিপেট:** ঠিক। যদি খোলামেলাভাবে চিন্তা করি, তাহলে তুরস্কের গৌরবময় অতীতের সাথে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় এখন। তাই না?

মোস্তফা আকিউল: অবশ্যই। তুরক্ষে কিছু কথা প্রায় শোনা যায়। যেমন, আপনি কামালপন্থী হয়ে থাকলে আপনার দৃষ্টিতে সেরা সময়টা ছিল আতাতুর্কের যুগ। আর

আপনি যদি রক্ষণশীল হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার সেরা সময়টা ছিল উসমানীয় শাসনামল। সব কিছুকে আপনি শুধু সাম্রাজ্যের সময়ের সাথে মেলাতে থাকবেন। তবে তারমানে এই নয় যে আপনি আবার সেই সাম্রাজ্যে ফিরে যেতে চান বা দেশ দখল করতে চান। বরং আপনি সেই সাম্রাজ্যের মানদণ্ডে পুরো দুনিয়াকে মাপতে থাকবেন!

বসনিয়ার কথাই ধরুন। তুর্কিরা তাদেরকে ইউরোপীয় মুসলিম ভাই হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। কারণ, বসনিয়া এক সময় উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, উসমানীয় আমলে বসনিয়ানদের মধ্য থেকে কেউ কেউ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। উসমানীয় সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অনেকেই জাতিগতভাবে ছিলেন তুর্কি, ফিলিস্তিনি কিংবা বাগদাদের অধিবাসী। অর্থাৎ জাতীয়তা নিয়ে তখন কোনো পার্থক্য করা হতো না। এ ধরনের ব্যবস্থা যদি এখনকার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মেলাতে যান, তাহলে দেখবেন উসমানীয় শাসনব্যবস্থা ছিল অনেক উদার। আর এর বিপরীতে যে সেকুলারিজম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, সেটা ছিল নিছক জাতীয়তাবাদী চিন্তাপ্রসূত এবং অত্যন্ত সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন।

ক্রিস্টা টিপেট: ২০১১ সালের মিশর সফরে এরদোয়ানকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। তারা এরদোয়ানের নেতৃত্বকে বেশ পছন্দ করে। তাছাড়া সমাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের জন্য সৌদি আরবের চেয়ে তুর্কি মডেল তাদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। আমেরিকান থিন্ধ ট্যাঙ্কের এক জরিপ থেকে এ বিষয়টি উঠে আসে। জরিপে দেখা যায়, ৪১ শতাংশ মিশরীয় তুরস্ককে, ২৫ শতাংশ সৌদি আরবকে এবং ৫ শতাংশ লোক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সুপার পাওয়ার হিসেবে দেখতে চায়। এরদোয়ান সেখানে খুবই প্রশংসিত একজন নেতা এবং তুরস্ক আরো বেশি প্রশংসিত। অথচ ইসলামের রোল মডেল হিসেবে সমাজ ও রাজনীতিতে সৌদি আরবের আরো বেশি ভূমিকা থাকার কথা।

তবে আমি একটা ব্যাপারে আগ্রহী। সেটা হলো, আপনি আশির দশকে তুরস্কের ইসলামী সংস্কার সম্পর্কে লিখেছেন। সেই সংস্কারের ফলে যে সব নতুনত্ব এসেছিল তার ফলাফল আপনি নিজেও। আমার প্রশ্নটা হলো, ইসলামী মূল্যবোধকে ধারণ করে তুরস্ক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার যে মডেল দাঁড় করাতে যাচ্ছে, তার বিশেষ দিকগুলো কী কী?

মোস্তফা আকিউল: প্রথমেই বলে নিই, মধ্যপ্রাচ্যে এখন তিনটি মডেল দেখা যায়। একটা হলো ইরানী মডেল, যেখানে ধর্মতন্ত্র শাসনব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেখানে ইসরাইলকে ধ্বংস করার মনোভাব বেশ তীর।

আরেকটা হলো সৌদি মডেল, যারা রাজনৈতিকভাবে মধ্যপন্থী। যেমন, তারা ফিলিস্তিন-ইসরাইল সমস্যার দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানে আগ্রহী। তবে তারা ধর্মীয় দিক থেকে খুবই রক্ষণশীল ও কর্তৃত্বাদী। ধর্মীয় পুলিশ দিয়ে সেখানে ধর্ম পালনে বাধ্য করা হয়! তাই সৌদি আরবকে সালাফী মডেল বলা যেতে পারে।

আর সর্বশেষ মডেলটি হলো সাম্প্রতিক তুরস্ক। ১০ বছর আগেও তুরস্ক অপ্রাসঙ্গিক ছিল। কারণ, এটি ছিল কট্টর সেকুগলার রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্রটা মিলিটারি জেনারেলদের কথায় উঠত বসতো। মধ্যপ্রাচ্যে এমনটা আর দেখা যায়নি। যেখানে হেডস্কার্ফ পরা পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। কে জানতো, সেই তুরস্ক এক সময় মুসলিম বিশ্বের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করবে!

যারা ঐতিহ্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধে আস্থা রাখে এবং একই সাথে আধুনিকতারও অংশীদার হতে চায়, তাদের জন্য বর্তমান তুরস্ক একটি নতুন মডেল। তিউনিশিয়ার আননাহদা পার্টির কথাই ধরুন। তাদের বক্তব্য হলো, "আমরা মুসলিম এবং আমাদের ঐতিহ্য ইসলাম। তাই বলে আমরা ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি না। আমরা বরং অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সমাজ সংস্কার ও আধুনিকায়নে সেক্যুলারদের সাথে একত্রে কাজ করতে চাই।"

আননাহদার এই কথার সূত্রই হলো তুর্কি মডেল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো আরবরা এই মডেল কতটুকু বোঝে এবং গ্রহণ করছে? কারণ, আরবদের সাথে আমাদের যে সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি করা হয়েছে, তা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আর দ্বিতীয় কথাটি হলো, তুর্কি মডেলটা হুবছ্ অনুসরণ করা উচিত হবে না। কারণ, প্রত্যেকটি দেশের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ রয়েছে। সেগুলোকে ভিত্তি করে তাদের নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিৎ। সবার উচিত তুরস্ককে অনুকরণ করা— এ ধরনের কথা বলা খুবই বোকামিসুলভ হবে। তবে একনিষ্ঠ মুসলিম হলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো তুরস্ককে অনুরসণ করা যেতে পারে। তবে আসল মনোযোগ থাকতে হবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে। হয়তোবা আন্তর্জাতিক সংস্থায় সদস্যপদ থাকবে, তুরস্ক যেমন ন্যাটোভুক্ত দেশ। তারমানে আপনার সমাজের মূল্যবোধের বিপরীত কিছু আপনাকে করতে হবে, তা নয়। যেমন: আপনি ফিলিস্তিনির পক্ষে কথা বলবেন, তবে ইসরাইলের অন্তিত্বের বিরোধিতা করে নয়। দেখুন তুর্কি সরকার ফিলিস্তিনের সমর্থক হলেও ইসরাইল রাস্ট্রের অন্তিত্বের বিরোধি নয়। তুর্কি সরকার কিছু কিছু ইস্যুতে ইসরাইলের খুব কড়া সমালোচনা করে থাকে। তবে আদতে তুর্কি সরকার দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানে আগ্রহী।

মোটকথা হলো, আরব বসন্তের পর থেকে আরব অঞ্চলে পরিবর্তনের জন্য যারা রাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তুরস্ক তাদের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে। কারণ, তারা শুধু ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলই নয়, বরং মনমানসিকতায় আধুনিক এবং বাস্তববাদীও বটে।

## <u>চতুর্থ পর্ব</u>

[On being থেকে ক্রিস্টা টিপেট বলছি। ধর্ম, নৈতিকতা ও এ সম্পর্কিত চিন্তাভাবনাণ্ডলো নিয়ে বলছিলেন মোস্তফা আকিউল। এ আলোচনায় ধর্ম ও গণতন্ত্র নিয়ে উদীয়মান তুরস্কের পদক্ষেপণ্ডলো তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।]

ক্রিস্টা টিপেট: 'ইসলামিক ক্যালভিনিস্ট' (সংস্কারবাদী) ধারণাটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের আমেরিকান গণতন্ত্রের সাথে এর একটা মিল পাওয়া যাচছে। সে সময় রোটারি ক্লাব, দ্যা চেম্বার অব কমার্স, দ্যা ইয়াং ম্যান'স ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েশনসহ সকল নাগরিক সংগঠনই ছিল খ্রিষ্টধর্মভিত্তিক। অবশ্য ধীরে ধীরে কয়েক প্রজন্মের ব্যবধানে এগুলো সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে যায়।

মোস্তফা আকিউল: 'European Civil Initiative' নামের একটি ইউরোপীয় থিক্ষ ট্যাঙ্ক 'ইসলামিক ক্যালভিনিস্ট' টার্মটি প্রথম ব্যবহার করে। তুরক্ষের রক্ষণশীল ব্যবসায়ীদের — বিশেষত তুরক্ষের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল — নিয়ে সংস্থাটি গবেষণা করেছে। আপনি যদি ...

ক্রিস্টা টিপেট: রক্ষণশীল বলতে কী বুঝাচ্ছেন? ধর্মীয় নাকি রাজনৈতিক?

মোস্তফা আকিউল: ধর্মীয়ভাবে রক্ষণশীল। তাদের ব্যবসাসফল কোম্পানি রয়েছে। তারা রেফ্রিজারেটর, টিভি, ব্লু-জিন্স ইত্যাদি উৎপাদন করে। এগুলো তারা মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকাসহ সারাবিশ্ব রপ্তানি করে। তারা সফল উদ্যোক্তা এবং পরিশ্রমী ব্যবসায়ী।

বিশেষ করে কোনিয়া এবং কায়সেরির মতো তুরক্ষের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর মানুষজন ধর্মীয়ভাবে বেশ রক্ষণশীল। এসব ব্যবসায়ী গোষ্ঠী মূলত এই শহরগুলোতে বসবাস করে। তারা মুহাম্মদকে (সা.) যোদ্ধা নয়, বরং ব্যবসায়ী হিসেবে দেখে থাকে। মহানবীকে (সা.) অনুসরণ করে তারাও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে এবং অর্থ উপার্জন করছে। তারা উপার্জিত অর্থকে সামাজিক উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করে। এই ব্যবসায়ীরা জনস্বার্থে দাতব্য সংস্থাগুলোতে দান করে, গরীব ছাত্রদেরকে বৃত্তি দেয়। এমনকি দরিদ্রদের জন্য তারা খাবারের দোকানও খুলেছে। তুরক্ষে এ ধরনের উদ্যোগ নেয়ায় তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। তুরক্ষের দাতব্য খাত বেশ বড়। গাজা ফ্রোটলার মতো কিছু উদ্যোগ অবশ্য রাজনৈতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। তবে এটা একটা উদাহরণ মাত্র। অরাজনৈতিক উদ্যোগই বেশি।

এসব তো দেশের ভেতরকার কথা। তুরস্কের এনজিও এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের বাইরেও তাদের সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আফ্রিকার অবহেলিত অঞ্চলে তারা খাদ্য ও ঔষধপত্র নিয়ে যাচ্ছে। তারা স্কুল চালু করেছে। সুনামী দুর্গত মানুষের জন্য পৌঁছে দিচ্ছে সহযোগিতা। মূলত এ অঞ্চলের ধর্মীয় রক্ষণশীল মানুষেরাই এ ধরনের অর্থনৈতিক সহযোগিতা করে যাচ্ছে। তারা মনে করে, প্রতিবেশীকে সহযোগিতা করাটা আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব।

আরেকটা ব্যাপার হলো, তুরস্কের এ ধরনের মানুষেরা এরদোয়ানের ভোট ব্যাংক হিসাবে কাজ করে। কারণ তারা দেখতে পাচ্ছে, এরদোয়ানের কর্মকাণ্ডে তাদের মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটছে। এছাড়া এরদোয়োন এসব ব্যবসায়ীদের সহায়তাও করছেন। কারণ, একেপি ব্যবসায়ী পরিচালিত দলও বটে। তাই একেপির নীতির সাথে তুরস্কের আর্থিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের মিল রয়েছে।

এসব বিবেচনায়, তুরক্ষের এই সামাজিক রূপান্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় আচার-আচরণেও ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে। ইসলামপন্থী সংস্কারবাদীরা তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিচ্ছে। আসন্ন পরিবর্তনটা যাতে গঠনমূলক হয় সে জন্য তারা কখনো কখনো বাপদাদাদের চেয়েও অনেক বেশি খোলামেলা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করছে না। তবে অবশ্যই এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া।

**ক্রিস্টা টিপেট:** হুম, যুক্তরাষ্ট্রের সমাজেও পরিবর্তন আসতে বেশ সময় লেগেছিল।

মোস্তফা আকিউল: একদম ঠিক বলেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে চার্চ কর্তৃক যেসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলো একসময় সেক্যুলার এবং সার্বজনীন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আমি আশা করি, তুরস্কের সুশীল সমাজও এ ধরনের সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সচেষ্ট আছেন। এর ফলে তুর্কি জনগণ বৈশ্বিকতাকে অনুধাবন করবে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠবে আরো বাস্তবসম্মত।

ক্রিস্টা টিপেট: অবশ্যই। গত ১০ বছর ধরে ইসলাম নিয়ে আমি বহু লোকের সাথে কথা বলে আসছি। আপনি তো প্রচলিত ধার্মিক হিসেবে বেড়ে উঠেননি। আপনি বলেছেন, আপনি শুধু ধর্মতাত্ত্বিকভাবে অনুপ্রাণিত। আমার জানতে ইচ্ছে করছে, আপনার মতো যারা আছেন তাদের মনোভাব এখন কী রকম?

মোস্তফা আকিউল: প্রথমেই বলা দরকার, আমেরিকানরা এমন এক সময়ে ইসলাম সম্পর্কে শুনছে এবং দেখছে, যখন মুসলিমরা ইসলামী মূল্যবোধ থেকে সামগ্রিকভাবে অনেক দূরে সরে গেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিমদের অনাকাঞ্চিত ক্রটিগুলোই তাদের চোখে পড়ছে। তেমনি মুসলিমরাও সময়ে সময়ে পশ্চিমাদের উগ্রতা দেখেছে। ২০১০ সালে ফ্লোরিডার এক ব্যক্তির কোরআন পোড়ানোর খবরটা তুরস্কে পোস্টার লাগিয়ে প্রচার করা হয়েছে। যদিও ঐ ব্যক্তি পুরো খ্রিষ্টান সমাজের হয়ে কাজটা করেনি, তবুও খবরটা এমনভাবে ছড়িয়েছে যেন সব খ্রিষ্টানরাই কাজটা করেছে।

উগ্রপন্থী কিছু আলেম রয়েছে যারা এ ধরনের খবরগুলো ছড়িয়ে দিয়ে মানুষকে উসকে দেয়। তারা অন্যের বিশ্বাসকে সম্মান করতে জানে না। অবশ্য সেসব আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গি মূলধারার ইসলামী সমাজ থেকে বেশ আলাদা।

মুসলিম মানসিকতায় যে অনেক সংস্কার দরকার, তা অনস্বীকার্য। ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দরকার। মধ্যযুগে ইউরোপীয় অঞ্চলে যখন ক্যাথলিক শাসন চলছিল তখন সেখানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। অথচ সে সময়ের মুসলিম সাম্রাজ্যগুলো ছিল ধর্মীয় স্বাধীনতা চর্চার প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু এখন আর তা নেই। নারী এবং সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে এখনকার মুসলিমরা অনেক সংকীর্ণ হয়ে গেছে। তাই এসব ইস্যুতে আলোচনা হওয়া দরকার, সংস্কার দরকার। কিন্তু মুসলিম দেশগুলো যদি বিদেশী শক্তি বা সেকুগুলার একনায়কতন্ত্রের পদানত হয়ে থাকে, তাহলে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব হবে না। এ ধরনের শাসক গোষ্ঠী শুধু ধার্মিক মুসলিম হওয়ার কারণে মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। ফলে এ ধরনের শাসনব্যবস্থা মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কার প্রক্রিয়াকে বরং বাধাগ্রস্ত করেছে।

তাহলে পরিবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কী কী? গুরুত্বপূর্ণ হলো: ইসলামের প্রতি বিশ্বস্ততা, বৈশ্বিক পরিবর্তন সম্পর্কে বাস্তববাদী জ্ঞান ও যৌক্তিক চিন্তা। মানসিকতা হতে হবে উদার। আর এসব বিষয় নির্ভর করবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কী ধরনের মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠছে— তার উপর। এছাড়া শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, চিন্তাবিদ এবং জননেতৃবৃন্দ সামাজিক মূল্যবোধের উপর কতটুকু আস্থাশীল, সেটাও বিবেচনার বিষয়। কেউ যদি পরিবর্তনের কথা বলে তাকে অবশ্যই উদারতার কথাও বলতে হবে। আর এ দায়িত্বটা পালন করতে হবে তার মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের জায়গা থেকে, শুধুমাত্র বিশ্বাস প্রচার করার উদ্দেশ্যে নয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ইদানীং কিছু লোক নাম কামিয়েছেন, যারা এক সময় মুসলিম ছিলেন। তারা বলছেন, 'ইসলাম খুবই বাজে ধর্ম। তাই আমি এ ধর্ম পরিত্যাগ করেছি।' আমি তাদের মতামতকে শ্রদ্ধা করি, তবে তাদের সাথে একমত নই। পশ্চিমাদের ধারণা, এই লোকগুলো বোধহয় মুসলিম সংস্কারক। কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব? মুসলিম সংস্কারককে তো আগে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, তারপরই না সংস্কার!

ক্রিস্টা টিপেট: তার মানে হলো, নামমাত্র মুসলিম হওয়াটা সংস্কারের জন্য যথেষ্ট নয়। সবার আগে একে ধারণ করা জরুরি?

মোস্তফা আকিউল: যারা ইসলামের বদনাম করে বেড়ায় তারা মুসলিম বিশ্বের ইতিবাচক পরিবর্তনে নেতৃত্ব দেবে— এটা আপনি আশা করতে পারেন না। আসলে তারা চায় না কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আসক। ইসলামের বিরুদ্ধাচারণকে সাধারণ মুসলিম জনগণ ইসলামের উপর সরাসরি আঘাত বলে মনে করে। ফলে ইসলাম প্রশ্নে তারা আরো রক্ষণশীল হয়ে পড়ে।

ক্রিস্টা টিপেট: তুরস্ক সম্পর্কে আপনি লিখেছেন যে তুর্কি আইডেন্টিটি মুসলমানিত্বের সমার্থক। অথচ অতীতকাল থেকে এখন পর্যন্ত তুরস্ক হলো ইস্টার্ন অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের মূল কেন্দ্র। সারা দুনিয়াতে অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের সংখ্যা প্রায় ৩০০ মিলিয়ন। এ সপ্তাহের শেষদিকে আমরা আর্চবিশপ বার্থোলোমিউর সাথে দেখা করতে যাবো। তাহলে কি বলা যায় যে তুরস্কও মুসলিম-খ্রিষ্টানদের পারস্পরিক বিরোধিতার একটি ক্ষেত্র?

মোন্তফা আকিউল: ইকুমেনিক্যাল প্যার্ড্রিয়ার্কের আর্চবিশপ বার্থোলোমিউ হলেন তুরন্ধের সম্পদ। একজন খ্রিষ্টান ধর্মীয় নেতা হিসেবে আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী একজন ব্যক্তি। ধর্মীয় মতবিনিময় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে তিনি অত্যন্ত গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেন। ইকুমেনিক্যাল প্যার্ড্রিয়ার্ককে আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখি। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, বিশ শতকের কিছু তুর্কি এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে অসম্মানজনক আচরণ করেছে। তবে এসব কাজ ইসলামী চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কেউ করেনি। বরং জাতীয়তাবাদী চেতনাই ছিলো এর কারণ।

এমনই একটি কারণ হিসেবে তুরস্কের সাথে গ্রীসের রাজনৈতিক উত্তেজনার কথা বলা যায়। বিরোধটা ছিল সাইপ্রাস নিয়ে। এসব রাজনৈতিক ইস্যুতে তুরস্কে গ্রীক বংশোদ্ভূত লোকদের হেয় প্রতিপন্ন করা হতো। যদিও তারা ছিল তুরস্কেরই নাগরিক। তবে তুরস্কের বেশিরভাগ মানুষ এ ধরনের কাজকে সমর্থন করতো না। অনেকেই তখন নির্যাতিত মানুষগুলোর দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। অন্যদিকে, তৎকালীন সেকুলার তুরস্কে পেট্রিয়ার্ক অনুসারীদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হয়নি বলে গ্রীসেও তুর্কি মুসলিমরা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেনি।

ধর্মীয় স্বাধীনতা না পাওয়া খ্রিষ্টান এবং ইহুদীদের মনে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। যা হোক,

<sup>ু</sup> মোটাদাণে, খ্রিষ্টধর্মের তিনটি ধারা রয়েছে: ক্যাথলিক, প্রটেস্ট্যান্ট এবং (ইস্টার্ন) অর্থোডক্স। ক্যাথলিক ধারার নেতৃত্বে থাকেন পোপ ও ক্যাথলিক বিশপগণ। প্রটেস্ট্যান্ট ধারা আবার অসংখ্য উপধারায় বিভক্ত। প্রত্যেকেরই নিজস্ব ব্যাখ্যা রয়েছে। ফলে এই ধারার কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নেই। আর অর্থোডক্স ধারার অনুসারীগণ স্থানীয় সায়নড (চার্চ) দ্বারা স্বাধীনভাবে পরিচালিত হন। পোপের মতো এই ধারায় কর্তৃত্বসম্পন্ন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নেই। তবে তুরক্ষে অবস্থিত ইকুমেনিক্যাল প্যার্ট্রিয়ার্ক অব কনস্টান্টিনোপলের আর্চবিশপ বিশ্বজুড়ে অর্থোডক্স খ্রিষ্টানদের আধ্যাত্মিক নেতা ও প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃত। বার্থোলোমিউ প্রথম (Bartholomew I) বর্তমানে এই চার্চের দায়িত্ব পালন করছেন। — অনুবাদ সম্পাদক

একবিংশ শতকের শুরুতে তুরস্কের অবস্থা দেখে আশা করতেই পারি, সেই বিপর্যয়ের অবসান ঘটেছে। যদিও বাকস্বাধীনতা ইস্যুতে এখনো একেপির সমালোচনা করার যথেষ্ট কারণ আছে। তবে এটাও সত্য যে এরদোয়ান সরকার তুর্কি খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের ধর্ম পালনের উপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছে।

ক্রিস্টা টিপেট: আমার জানা মতে, এ প্রসঙ্গে পেট্রিয়ার্ক বার্থোলোমিউ বলেছেন, তাঁরা সেকুগুলার আমলের চেয়ে ইসলামপন্থী সরকারের আমলে অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারছেন।

মোন্তফা আকিউল: একদম ঠিক। কারণ, তুরক্ষের সেকুগলারিস্ট সরকার সকল ধরনের ধর্মচর্চাকে নিষিদ্ধ করেছিল। এমনকি খ্রিষ্টধর্মকেও। ফলে সব ধর্মের ধার্মিক জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। কর্তৃত্ববাদী সরকারের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে একমত ছিলেন। সে সময় প্রখ্যাত কিছু মুসলিম ব্যক্তিত্ব পেট্রিয়ার্ক ও সংখ্যালঘু ইহুদীদের উপর যে কোনো ধরনের জাতীয়তাবাদী বা সাম্প্রদায়িক আচরণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। ব্যাপারটা ভাবতেই ভালো লাগে। তাঁদের মতো করে এখন আমাদেরও এগিয়ে আসতে হবে। এছাড়া পেট্রিয়ার্ক কর্তৃক পরিচালিত Halki Seminary স্কুলটাও তুরক্ষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রতিষ্ঠান...

**ক্রিস্টা টিপেট:** স্কুলটা এখনো খুলে দেয়া হয়নি।

মোন্তফা আকিউল: অবশ্যই এটা খুলে দেয়া উচিৎ। এখনো পর্যন্ত খুলে না দেয়ার কারণ আমি জানি না। তবে তুরস্কের শিক্ষা আইনে এখনো কিছু সমস্যা রয়ে গেছে। তুরস্কে কোনো ধরনের বেসরকারী শিক্ষাব্যবস্থার অনুমতি নেই। এসবের মূলে রয়েছে সরকারী নিয়ন্ত্রণ। এমনকি ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাও সরকারের অধীন। এরদোয়ানের উচিত হবে এ ব্যাপারে দ্রুত সংস্কার আনা।

বিশ্বের সামনে নয়া তুরস্ককে মডেল হিসেবে দাঁড় করাতে চাইলে আমাদের আগের চেয়ে আরো বেশি গণতান্ত্রিক এবং আরো ভালো মুসলিম হতে হবে। এমনকি আরো উদার হতে হবে। তবে এটা ঠিক যে সমস্যা থাকবেই। সবকিছু একেবারে যথাযথভাবে সমাধান হয়ে যাবে, এমনও নয়। তবে আশা করি, এরদোয়ান সরকারের গৃহীত সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। এসব সংস্কারমূলক পদক্ষেপের ফলে তুরস্কের ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাও উপকৃত হবে বলে আশা রাখি।

ক্রিস্টা টিপেট: তুরক্ষের পরিবর্তনগুলো সেক্যুলার তুর্কিদের জন্য শঙ্কার সৃষ্টি করছে। এক্ষেত্রে তাদের জন্য পদক্ষেপটা কী ধরনের হবে? অর্থাৎ তুরক্ষের উদীয়মান রাজনৈতিক ইসলামপন্থীরা তাদের জন্য কী করবে? মোস্তফা আকিউল: সেক্যুলারিস্ট তুর্কিদের কথা বলছেন তো? সেক্যুলার এবং সেক্যুলারিস্টদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

**ক্রিস্টা টিপেট:** আচ্ছা, সেক্যুলার এবং সেক্যুলারিস্ট।

মোস্তফা আকিউল: উদারপন্থী সেক্যুলারদের চিন্তার সাথে সেক্যুলারিস্টদের পার্থক্য রয়েছে।

**ক্রিস্টা টিপেট:** ও আচ্ছা। অনেকে আবার সেক্যুলার হলেও ব্যক্তিগতভাবে ধর্মে বিশ্বাসী। তাই তো?

মোন্তফা আকিউল: থাঁ, ঠিক ধরেছেন। আপনার প্রশ্নটা ছিল সেকুগলারিস্টদের সম্পর্কে। আসলে তাদের বুঝা উচিত, যদি তারা ক্ষমতায় যেতে চায় তাহলে নির্বাচনে জিততে হবে। নির্বাচিত সরকারের বিপরীতে তারা মিলিটারি এবং জুডিশিয়ারির মাধ্যমে এখনো ক্ষমতা ভোগ করছে। এগুলোর জোরেই মূলত তারা তাদের আদর্শটাকে এখনো টিকিয়ে রেখেছে। এ জন্যই হয়তো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তারা ঝিমিয়ে পড়েছে। তুরক্ষের ভবিষ্যুৎ নিয়ে তাদের কোনো ভিশন নেই। তারা জানে না অর্থনীতি কীভাবে পরিচালনা করতে হয়। কথাগুলো মূলত তুরক্ষের বর্তমান প্রধান বিরোধীদলকে নিয়ে, যারা তুর্কি সমাজে সেকুগুলারিস্টদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। অর্থনৈতিক ভিশন, বৈশ্বিক বুঝজ্ঞান, পররাষ্ট্রনীতি— এসব ব্যাপারে তাদের অবস্থান এরদোয়ানের একেপির তুলনায় খুবই দুর্বল। যদি তারা নির্বাচনে জিততে চায়, তুর্কি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে চায়, তাহলে ইসলামপন্থীদের কাছ থেকে তারা শিক্ষা নিতে পারে।

ক্রিস্টা টিপেট: আমরা মানচিত্রে তুরস্কের বিস্ময়কর ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে কথা বলছিলাম। অর্থাৎ তুরস্ক বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থান করছে এবং বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণে প্রস্তুত হচ্ছে।

মোন্তফা আকিউল: তুরস্কের প্রতিবেশীগুলোর দিকে একবার তাকান। সিরিয়ার সাথে রয়েছে আমাদের সবচেয়ে দীর্ঘ সীমান্ত, দেশটা এখন সবচেয়ে অশান্তিতে আছে। তারপর আছে ইরান। এছাড়া ককেশাশের দিকে আছে আজারবাইজান, জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া। দুঃখজনকভাবে আর্মেনিয়ার সাথে সীমান্ত যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। আমাদের প্রতিবেশী প্রত্যেক দেশেরই অভ্যন্তরীণ নানা সমস্যা রয়েছে। অপরদিকে ইউরোপীয় প্রতিবেশীদের দিকটা মোটামুটি স্থিতিশীল। অতীত বাদ দিলে গ্রীসের সাথে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ ভালো যাচ্ছে। তবে গ্রীসও এখন ভেঙে পড়ছে। তাই গ্রীসের সম্ভাব্য পরিবর্তন নিয়েও তুরস্ককে ভাবতে হবে। সুতরাং, সবদিক

বিবেচনা করলে প্রতিবেশীদের নিয়ে তুরস্ককে কঠিন সময় পার করতে হতে পারে।

অবশ্য এ ধরনের পরিবেশের অসুবিধা যেমন আছে, তেমনি সুবিধাও রয়েছে। একটা রাষ্ট্র তার প্রতিবেশীকে ইতিবাচকভাবেও প্রভাবিত করতে পারে। যেমন: আরব বসন্তের সময় মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছিল। সিরিয়ার সাথে বর্তমানে তুরক্ষের সম্পর্কে বেশ উত্তেজনাপূর্ণ। কারণ, তুরস্ক সরকার যৌক্তিকভাবেই আসাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলছে। কিন্তু আমি মনে করি, এ ধরনের ভয়ঙ্কর প্রতিবেশীকে সহায়ক বন্ধুতে পরিণত করে ফেলা যায়। যেমন: ইরানের পরমাণু বিতর্কের কূটনৈতিক সমাধানে তুরস্ক বেশ দক্ষতা দেখিয়েছে। সংকট সমাধানে ইরানকে পশ্চিমাদের সাথে আলোচনার টেবিলে বসিয়েছে। অবশ্য সমাধান না আসা পর্যন্ত আলোচনা অব্যাহত রাখতে তুরস্ক চেষ্টা চালিয়ে যাবে। কিন্তু ইরানের সাথে আলোচনা...

**ক্রিস্টা টিপেট:** আমিও মনে করি তুরস্ক সেটা করতে পারবে।

মোন্তফা আকিউল: হ্যাঁ। ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ইরান ও পশ্চিমাদের মধ্যকার আলোচনাটা বেশ ফলপ্রসূ ছিল। বারাক ওবামার সাথে বৈঠক করে এরদোয়ান পরদিন গেলেন আয়াতুল্লাহ খামেনীর সাথে কথা বলতে। তুরক্ষের দূতিয়ালির উপর উভয় পক্ষ আস্থা রেখেছে। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে এ ধরনের ঘটনা খুবই বিরল বলা যায়। ইরান হয়তো তুরক্ষের সীমান্তবর্তী দেশ বলে এক্ষেত্রে সুবিধা অর্জন করতে পেরেছে। আশা করি, এটার ভালো একটা ফলাফল আসবে।

তুরস্ক তার সীমানার অপর পাশটা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভয়ের মধ্যে ছিল। এক সময় স্কুলে আমাদের পড়ানো হতো, 'তুরস্কের তিন দিকে সমুদ্র আর চতুর্দিকে শত্রুদেশ দিয়ে ঘেরা।' আশির দশকে স্কুলে আমরা এগুলো শিখেছি। আর প্রধানমন্ত্রী এরদোয়ান এসে বলছেন, তুরস্ক আর আগের মতো নেই। তুরস্ক হতে যাচ্ছে বৈশ্বিক দুনিয়ার অংশীদার।

# একেপিতে আব্দুল্লাহ গুল আর নাই কেন ১

## মোন্তফা আকিউল | অনুবাদ: আবিদুল ইসলাম চৌধুরী

সম্প্রতি তুরক্ষের সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ গুলকে নিয়ে একটা রাজনৈতিক গুঞ্জন গুরু হয়েছে। গুল ইতোমধ্যে রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছেন। ক্ষমতাসীন একেপির মনোনয়ন নিয়ে তিনি হয়তো আবার সংসদে ফিরবেন এবং রাজনীতিতে পুনরায় সক্রিয় হবেন। তবে গত সপ্তাহে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে তিনি বলেন, "আমি আর সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ নেবো না। তবে যখনই প্রয়োজন হবে তখনই আমার চিন্তা-গবেষণা দিয়ে তাদেরকে (একেপি) সাহায্য করে যাবো।"

সাধারণত রাষ্ট্রনায়ক এবং রাজনীতিবিদগণ যখন বুঝতে পারেন যে রাজনীতিতে তাদের সময় শেষ তখন তারা অবসর নিয়ে নেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ গুলের ব্যাপারটা তেমন নয়। তাঁর বয়স এখন ৬৪ বছর। সক্রিয় রাজনীতি ছেড়ে দেয়ার জন্য বয়সটা খুব বেশি নয়। ২০০১ সালে যে আব্দুল্লাহ গুল নিজেকে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, জরিপে দেখা যাচ্ছে তিনি এখনো বেশ জনপ্রিয় এবং জনগণের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। টানা সাত বছর দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। এ দায়িত্ব পালন শেষে নেতা হিসেবে পুনরায় দলে ফিরে আসার ব্যাপারটা নিয়ে ২০১৪ সালের আগস্টের আগ পর্যন্ত বেশ আলোচনা ছিল। তারপর এরদোয়ান রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন এবং খুব সাবধানে তাঁর রাজনৈতিক পরিকল্পনার ছক তৈরি করলেন। দলের নেতৃত্বে আবদ্লাহ গুলের ফিরে আসার স্যোগ তিনি আটকে দিলেন। এক্ষেত্রে অবশ্য আহমেদ

\_

২০১৫ সালের ১৪ মার্চ 'Why Gül is not in the AKP anymore' শিরোনামে মোস্তফা আকিউল Hurriyet Daily News পত্রিকায় একটি নিবন্ধ লেখেন। এটি সেখান থেকে অনুদিত।

দাউতোগলু এরদোয়ানের সুনজর লাভ করেন।

বলা হয়ে থাকে, আব্দুল্লাহ গুল ব্যক্তিগত কারণে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু এর সাথে আরো গভীর কিছু বিষয় জড়িত রয়েছে। গুলের শাসনামলের (২০০১-২০০৭) একেপি এবং বর্তমান সময়ের একেপির রাজনৈতিক চরিত্রে অনেক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। শুরু দিকের একেপিকে আমি বলি 'পুরাতন একেপি' আর বর্তমানটাকে বলি 'নতুন একেপি'। এ দুটোর মাঝের পার্থক্যগুলো সত্যি বিস্ময়কর। বুঝার জন্য একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম:

- ১. পুরাতন একেপি তুরক্ষে 'কোপেনহেগেন ক্রাইটেরিয়া' বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। অর্থাৎ রাজনীতি, আইন ও অর্থনীতিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেয়া মানদণ্ডে পরিবর্তন করতে তাদের চেষ্টা ছিল। কিন্তু নতুন একেপির এ ধরনের কোনো আগ্রহই দেখা যাচ্ছে না। বরং 'সাংহাই ইউনিয়নে'র ব্যাপারে একেপির আগ্রহের সুস্পষ্ট ইংগিত দেখা যাচ্ছে। রাশিয়া, চীন ও উজবেকিস্তানের মতো প্রভাবশালী দেশগুলো সেখানে রয়েছে।
- ২. পুরাতন একেপি তখন বিশ্বকে ষড়যন্ত্রতত্ত্ব দিয়ে বিবেচনা করতো না। দলটিকেই বরং ষড়যন্ত্রতত্ত্বের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নতুন একেপি অনেক ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রতত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করা শুরু করেছে।
- ৩. প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর জন্য পুরাতন একেপির নীতি ছিল 'জিরো প্রবলেমস উইথ নেইবরস'। কিন্তু নতুন একেপি অনেকগুলো সমস্যাই শুধু তৈরি করেনি, বরং প্রতিবেশীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাটাকে তারা বেশ উপভোগ করছে বলে মনে হয়!
- ৪. অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং বিশ্ববাজারব্যবস্থা বিবেচনা করে পুরাতন একেপি তাদের নীতি নির্ধারণ করতো। ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী আলী বাবাকান এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর এরদাম বাসিগি'র মতো ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় এ নীতির কিছু অংশ এখনো ঠিক আছে বটে। কিন্তু নতুন একেপি অর্থনীতিতে উল্টোপথ অনুসরণ করছে। তারা অর্থনীতিতে ইন্টারেস্ট রেট লবি'র (সুদের হার বৃদ্ধিতে তৎপর গ্রুপ) মতো কাল্পনিক দানবের ভীতি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। এমনকি কেন্দ্রীয় ব্যাংক দুর্নীতি করতে পারে— এ ধরনের অনাস্থামূলক আশংকার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

- ৫. পুরাতন একেপিকে বিনয়ী হিসেবে বিবেচনা করা হতো। সে সময় প্রতিবেশীদের সাথে মিলেমিশে ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্টে এরদোয়ান থাকতেন। কিন্তু বর্তমানে নতুন একেপিকে একটা অহংকারী দল বলে মনে করা যেতে পারে। এখন এরদোয়ান থাকেন বিশ্বের অন্যতম বিলাসবহুল বিরাট এক প্রাসাদে।
- ৬. পুরাতন একেপি ছিল উদার। অন্যকে গ্রহণ করে নেয়ার মতো মানসিকতা তাদের ছিল। তারা 'ঘরের-শত্রু' ধরনের ধারণার বিরোধী ছিল। বরং সবার সাথে সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতো। নির্বাচনের সময় তাদের স্লোগান ছিল— 'একই রংধনুতে আমরা ভিন্ন ভিন্ন রং'। কিন্তু নতুন একেপি 'শক্র', 'বিশ্বাসঘাতক', 'অশুভ শক্তি' ইত্যাদি বাগাড়ম্বরে বেশি বিশ্বাস করে। তাদের সংজ্ঞা মেনে নিলে দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীই এসব ক্যাটাগরিতে পড়ে যায়!

আদুল্লাহ গুল পুরাতন একেপির উদারবাদী মূলনীতিগুলোতে এখনো আস্থা রাখেন। অন্যদিকে, এরদোয়ান নতুন একেপিতে সর্বোচ্চ মাত্রায় কর্তৃত্বাদ চর্চায় আগ্রহী। আমি যতটুকু বুঝেছি, এ জন্যই আদুল্লাহ গুল আপাতত সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমি হতাশ এ জন্য যে গুল নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর চিন্তা, গবেষণা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারছেন না। যদি পারতেন তাহলে শুধু তুরস্ক নয়, সমগ্র মুসলিম বিশ্বও এ থেকে উপকৃত হতে পারতো।

# **भिक्तिक प्राल रेमला (स.स. या (यप स.स.)** ये म्हा भिन्न प्राति के प्रसास्त्रिय भिन्न भी

# তারিক রমাদান | অনুবাদ: আবিদুল ইসলাম চৌধুরী

'রাজনৈতিক ইসলামের দিন কি ফুরিয়ে আসছে?'— গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে এ ধরনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা চলছে। ইরান, আলজেরিয়া এবং মিশরের মতো দেশগুলোর নাজুক রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অলিভার রয় তার 'The Failure of Political Islam' শীর্ষক বইয়ে এ ধরনের একটা উপসংহার টানার চেষ্টা করেছেন। অথচ 'ইসলামিজম' ও 'পলিটিক্যাল ইসলাম' নিয়ে স্কলাররা পরিষ্কার কোনো সংজ্ঞাই এখন পর্যন্ত দাঁড় করাতে পারেননি! 'ইসলামিজম' ও 'পলিটিক্যাল ইসলাম' শব্দদ্বয়ের দুই ধরনের বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে। সেগুলো বিশ্লেষণ করলে এই প্রশ্নটা উঠে আসে: কীসের ভিত্তিতে 'পলিটিক্যাল ইসলামের' পতন সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়া হচ্ছে?

### সাংঘর্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি

সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো ও সুস্পষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যহীন বিশৃঙ্খল কিছু গ্রুপ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নিরীহ মানুষ হত্যা করে চলছে, তাদের কর্মকাণ্ডকে 'পলিটিক্যাল ইসলাম' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা কি যথাযথ কাজ? অন্যদিকে, এই ধারার বিপরীত চিত্র হলো ক্রমবিকাশমান তুর্কি মডেল। এই ধারা নাজিমুদ্দিন এরবাকান থেকে এরদোয়ান পর্যন্ত বিবর্তিত হয়ে আজকের জাস্টিস অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট পার্টিতে (একেপি) এসে পৌঁছেছে। তাই কোন যুক্তিতে একেপির মতো দলকে পলিটিক্যাল ইসলামের উদাহরণ হিসাবে বিবেচনা করা হবে না? এ প্রসঙ্গে আরো কিছু প্রশ্ন উঠে আসে।

তারিক রমাদানের 'Islam and the Arab Awakening' (২০১২, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস) বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের 'The End of Political Islam?' অনুচ্ছেদ থেকে এটি অনুদিত।

-

বিশ শতক থেকে শুরু করে আজকের একুশ শতক পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনগুলোতে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে? এখনো কি তাদেরকে পলিটিক্যাল ইসলামের ধারক-বাহক হিসেবে অভিহিত করা যাবে? পাশাপাশি ইসলামের নামে গণতন্ত্র ও নির্বাচন প্রত্যাখ্যানকারী সৌদি আরবসহ রাজতান্ত্রিক শাসকদের চাপিয়ে দেয়া আদর্শকেই বা কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? এটাও কি এক ধরনের রাজনৈতিক আদর্শ নয়, যা ইসলামের একটা সুবিধাজনক ব্যাখ্যার আলোকে গড়ে তোলা হয়েছে? পাশ্চাত্যবিরোধী যে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য ইসলামকে কাছে টানা একটা চমৎকার কৌশল। এর ফলেও অনেকের গায়ে 'ইসলামিস্ট' লেবেল লেগে যায়।

যাহোক, 'পলিটিক্যাল ইসলামের' পতন ঘোষণার আগে সংশ্লিষ্ট গবেষকদের উচিত ছিল এর একটি সর্বসম্মত সংজ্ঞা দাঁড় করানো। যাতে করে সকলে বুঝতে পারেন, এই টার্মটা আসলে কী ধরনের অর্থ বহন করে। অথচ এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজতত্ত্ববিদসহ অন্যান্য পণ্ডিতরা ন্যূনতম ঐক্যমত্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

#### পলিটিক্যাল ইসলামের বিবর্তন

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে বিশ ও একুশ শতকের শুরুতে ইসলামী সংগঠন এবং আন্দোলনগুলো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সময় পার করেছে। জামালুদ্দিন আফগানী ও মুহাম্মদ আবদুহের মতো উপনিবেশবিরোধী নেতৃস্থানীয় এবং সমসাময়িক ইসলামপন্থীদের কর্মপন্থা বিবেচনা করলে পার্থক্যগুলো সহজে ধরা পড়বে। দেখা যায়, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে ইসলামিস্টরা তাদের মতাদর্শ ও কর্মপন্থার পরিধিকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করেছেন। এতে অবশ্য সফলতা ও ব্যর্থতা— উভয়ই ছিল।

মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুডের সর্বোচ্চ পরিষদ 'দ্যা গাইডেন্স ব্যুরো' (মাকতাবুল ইরশাদ) গত একশত বছরে তাদের পুরোনো অবস্থান থেকে ক্রুমে সরে এসেছে। গণতন্ত্র, নারী অধিকার, রাজনৈতিক বহুত্বাদ এবং সুশীল সমাজের ভূমিকার ব্যাপারে ব্রাদারহুডের এই শীর্ষ পরিষদ নিজেদের দৃষ্টিভিন্তিকে বাস্তবতার আলোকে পরিবর্তন করেছে। দৃষ্টিভিন্তি ও কর্মকৌশলের ক্ষেত্রে পুরাতনদের সাথে নতুন প্রজন্মের মিল না থাকায় স্বভাবতই মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। ব্রাদারহুডের নেতৃত্বে যখন নতুন প্রজন্ম আসতে থাকে তখন পুরো সংগঠনটিতে একটা অব্যাহত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তাহলে কি বলবো, নতুন প্রজন্ম পূর্বসূরীদের আদর্শকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে? নতুন প্রজন্ম ইসলামপন্থী নয়? এ ধরনের চূড়ান্ত উপসংহার টানা বোধহয় উচিত হবে না।

তবে এটা স্বীকার করতে হবে, পলিটিক্যাল ইসলামের ধারক-বাহকদের একটা গ্রহণযোগ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এ পরিবর্তন নিছক পরিভাষাগত নয়, মতাদর্শ ও রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিকে প্রাধান্য দেয়ার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও এটি নিহিত।

গত এক শতান্দীতে বছরে যেসব বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূলতা ছিল, তাতে এরচেয়ে বেশি আর কী হতে পারতো? মরক্নো থেকে মিশর, তিউনিশিয়া-আলজেরিয়া থেকে লিবিয়া, সিরিয়া; এমনকি পাকিস্তান, ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়াসহ সব জায়গায় একই চিত্র দেখা যাচ্ছে।

এর আলোকে ইরানের অভিজ্ঞতাও শিক্ষণীয় বলা যায়। দার্শনিক আবদুল করিম সুরাশ থেকে শুরু করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী মীর হোসাইন মুসাভীর মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বরাও একটা সময় পর্যন্ত ১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবকে সমর্থন করেছিলেন। পরবর্তীতে তাদের অবস্থানের পরিবর্তন হয় এবং বিপ্লবী শাসনব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কারের পক্ষে তারা আওয়াজ তোলেন। নেতিবাচক অভিজ্ঞতা হওয়ার কারণে কেউ কেউ ইসলামের রাজনৈতিক ভূমিকা এখন আর স্বীকার করেন না।

তবে মুসাভী, মেহেদী কারুবীসহ সংস্কারপন্থীদের অধিকাংশই দাবি করেন যে তারা বিপ্লবী আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত । কিন্তু এখন ক্ষুদ্র একটা ধর্মীয় গ্রুপ যেভাবে কর্তৃত্ববাদী শাসনের ছড়ি ঘুরাচ্ছে, তা বিপ্লবী চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। ফলে তারা এর বিরোধিতা করেন। ইসলামী প্রজাতন্ত্রের রূপরেখা কী হওয়া দরকার, এ নিয়ে তাদের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। কিন্তু তাই বলে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তারা 'ইসলামী' চেতনা বাদ দিতে রাজি নন। প্রকৃতপক্ষে, তারা শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং নির্বিচারে গ্রেফতার, অযাচিত বিধিনিষেধ আরোপ এবং পুরোহিততান্ত্রিক স্বজনপ্রীতি বন্ধ করার পক্ষে। কারণ, এ ধরনের নেতিবাচক পদক্ষেপগুলো শুধুমাত্র ইসলামের মূলনীতিকেই শুধু লজ্মন করে না, ৭৯'র বিপ্লবের মূলনীতির বিরুদ্ধাচরণও বটে। অথচ ইসলামের নামে সেই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল ন্যায়ভিত্তিক রাজনীতি চর্চা করার জন্য, ক্ষমতার দাপট দেখাতে নয়।

ইসরাইলের ডেইলি হারেৎজ এবং রয়টার্সের ভাষ্য অনুযায়ী, আহমদিনেজাদ এবং মুসাভীর নীতির মধ্যে বারাক ওবামা কোনো পার্থক্য দেখতে পান না। দুজনের যিনিই ক্ষমতায় আসুক না কেন, দুই দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক হতে পারে উত্তেজনাপূর্ণ। বাস্তবতা হচ্ছে ইরানের শাসনব্যবস্থা আগের চেয়ে শক্তিশালী। এ অবস্থায় দেশ দুটো ভবিষ্যতে একসাথে কাজ করবে এমনটা আশা করা যায় না। লেবাননের হিজবুল্লাহ আর সিরিয়ার সাথে ইরানের রাজনৈতিক মিত্রতাও এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় বটে।

তুরস্কের উদাহরণটাও ফেলে দেয়ার মতো নয়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এরদোয়ান এবং তার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক গুরু সাবেক প্রধানমন্ত্রী এরবাকানের মধ্যে সুস্পষ্ট ও বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এরবাকান যখন ক্ষমতায় আসলেন ততদিনে তিনি একজন পুরোদস্তর অর্থনীতিবিদ। বিংশ শতকের প্রথম দিকে জন্ম নেয়া ইসলামিজম এবং প্যান-ইসলামিজমের চেতনা তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ফলে তিনি জি-৮-এর পাল্টা জোট তৈরি করে অর্থনৈতিক ভারসাম্য তৈরিতে উদ্বুদ্ধ হন। এ লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে তিনি তুরক্ষের অর্থ ও পররাষ্ট্রনীতিকে দক্ষিণ ও পূর্বমুখী করে তোলেন। তারপর তিনি মিশর, ইরান, নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও প্রাক্ষানকে নিয়ে গঠন করেন ডি-৮।

অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভরকেন্দ্র পরিবর্তনে মুসলিমপ্রধান দেশগুলো পরস্পর একসাথে কাজ করবে— এ প্রত্যাশায় ডি-৮ গঠন করা হয়েছিল। সে সময় এরবাকান বলেছিলেন, "ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যের হার যেখানে ৭০-৮০ শতাংশ, সেখানে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যের হার মাত্র ৭ শতাংশ। আমাদেরকে অবশ্যই বাণিজ্যের এই হার বাড়াতে হবে।"

উদ্দেশ্যটা ছিল পরিষ্কার— নিজ দেশে ইসলামীকরণ নীতির পাশাপাশি বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থার মধ্যেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে একটা নতুন 'ইসলামী' ক্ষমতা বলয় তৈরি করা। যদিও সেই প্রজেক্টটা ব্যর্থ হয়েছে, তবে এর মাধ্যমে এরদোয়ান এবং তার সাবেক গুরু এরবাকানের মধ্যকার পার্থক্যগুলো দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। এরবাকান ছিলেন ইসলামপন্থী। তিনি কঠোরভাবে পুঁজিবাদবিরোধী নীতি অনুসরণ করতেন। তবে সেটা আবার কমিউনিজমের নীতিও নয়, বরং 'অন্য কোনো উপায়' বলে তিনি দাবি করেন।

এরদোয়ান অবশ্য ভিন্ন পথে চলেছেন। তিনি তুরস্কের বৈদেশিক নীতিকে ইউরোপ ও পাশ্চাত্যের দিকে ফিরিয়ে নেন। মূলত অর্থনৈতিক কারণে তিনি তুরস্ককে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে আবেদন করেন। সেকুগুলারিজমকে মেনে নিয়ে সাংবিধানিক সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন এবং পুরনো ইসলামী স্লোগানগুলো পরিহার করেন। এসবের মাধ্যমে এরদোয়ান তুরস্কের অগ্রাধিকারগুলোকে ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরেন। তার মতে, আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে তুরস্কের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে হবে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিয়মকানুনগুলো অনুসরণ করতে হবে। যাতে বিশ্ব রাজনীতিতে তুরস্ক অপরিহার্য শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে 'জিরো প্রবলেম' নীতি এর একটা উদাহরণ।

## পুঁজিতান্ত্ৰিকতা ও পলিটিক্যাল ইসলাম

তুরক্ষের ঘরোয়া রাজনীতিতে একেপি একটি রক্ষণশীল দল। দলটি ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং নৈতিক অনুশাসনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করে। তবে একেপি কোনোভাবেই সৌদি আরবের মতো ইসলামের আক্ষরিক বয়ান প্রচারের পক্ষে নয়। তারা বরং ইসলামের সংস্কারপন্থী ধারার পক্ষে। তবে উভয়েরই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক এমন মিল রয়েছে, যা আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না। উভয় পক্ষই আদর্শের জায়গায় ইসলামকে নয়া উদারবাদী পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করে নেয়।

দেখা যায়, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনো রাষ্ট্রে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হলে একে 'ইসলামপন্থী' হিসেবে অভিযুক্ত করতে পাশ্চাত্য এক ধরনের অস্বস্তিতে ভোগে। অবস্থাটা এমন, যেন পুঁজিবাদ বিরোধিতার মাত্রা যে দেশে যত কম সেই দেশ তত কম ইসলামপন্থী। অন্যভাবে বলা যায়, পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে ইসলাম নিজেকে যতটুকু মেলে ধরতে সক্ষম হয়, রাজনীতি বিজ্ঞানে ইসলামের মাত্রা ততটুকু পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য। বাজার ব্যবস্থার এই শর্ত মেনে নিলে ইসলামপন্থীদের আর রক্ষণশীল বা অগণতান্ত্রিক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় না। যেমন, তেলসমৃদ্ধ রাজতান্ত্রিক দেশগুলোর রক্ষণশীলতাকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে মেনে নেয়া হয়। সেখানকার শাসন ব্যবস্থাকে সব দিক থেকে 'নব্য উদারপন্থা' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এগুলো আসলে নতুন কোনো বিষয় নয়। জামালুদ্দিন আফগানীর 'প্যান ইসলামিজম' আদর্শ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে, বিংশ শতকের শুরুর দিকে যেসব ইসলামপন্থী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল সেগুলোর বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল। সে সময় জামালুদ্দিন আফগানীর প্যান-ইসলামিজমের ধারণাকে অত্যন্ত ভয়ংঙ্কর আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কারণ, সেটা তখন মুসলিম বিশ্বকে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশবাদী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

এর অনেক বছর পর মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল বান্না মিশরের দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক আকারে ভূমি-সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলেন। বাজার অর্থনীতির খপ্পর থেকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোক্তাদের বাঁচাতে গড়ে তোলা হয়েছিল এই আন্দোলন। ব্যাপক সাফল্যের পরেও পরবর্তী কয়েক বছরে আন্দোলনটি স্তিমিত হয়ে পড়ে। কারণ জামাল আব্দুল নাসের সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের গড়ে তোলা বিকল্প ব্যাংক ব্যবস্থা এবং ফার্মগুলো বন্ধ করে দেন।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্রান্সিসকনের যাজক লিওনার্দো বফ, আর্চবিশপ হেল্ডার কামারা এবং পেরুর যাজক গুস্তাব গুটিয়ার্জ— এই তিনজন সন্তরের দশকে খ্রিষ্টান লিবারেশন থিওলজির যেসব মূলনীতি প্রণয়ন করেন, তার সাথে পলিটিক্যাল ইসলামের সম্পর্ক খুবই কাছাকাছি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাইয়েদ কুতুব পুঁজিবাদের মৌলিক সমালোচনা করে গেছেন। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের অন্যতম প্রবক্তা আলী শরীয়তীও (তাকে কেউ কেউ 'ইসলামী মার্ক্সবাদী' মনে করেন) একই ধারায় পুঁজিবাদের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু সারা বিশ্বের ইসলামপন্থীরা, এমনকি মুসলিম ব্রাদারহুডও সাইয়েদ কুতুবের এই কর্মপন্থা সবসময় অনুসরণ করেনি। বরং তা থেকে তারা অনেক দূরে সরে গেছে। সিরিয়ার ব্রাদারহুড নেতা মোস্তফা আস-সিবায়ী 'সমাজতান্ত্রিক ইসলামের' ধারণাটা লেখনীর মাধ্যমে সবার কাছে তুলে ধরেন। এ ধরনের কাজ সমসাময়িক অন্যান্য ইসলামপন্থী নেতাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি।

সময়ের আবর্তনে সবকিছু খুব দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমনটা হয়েছে বিশ্বের পুরোনো এবং নতুন প্রজন্মের ইসলামপন্থীদের প্রভাবশালী ধারাটির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে। উভয় প্রজন্ম বেশ সোৎসাহে রাজনৈতিক সংস্কারের পক্ষে জোরালো আওয়াজ তুলছে, যা আগে কখনো দেখা যায়নি। তারা যতই গলা ফাটিয়ে সমালোচনা করুক না কেন, প্রচলিত পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাপারে তাদের কোনো আপত্তি নেই।

গণতন্ত্র, আইনের শাসন, নাস্তিকতা ও নারীর ক্ষমতায়ন— এসবই এখন প্রধান ইস্যু, এতে কোনো সন্দেহ নেই। পলিটিক্যাল ইসলামের ধারণা খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। অর্থনীতিকে প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে ঐক্যমত তৈরি হয়েছে। তাই এই বিবর্তনকে পলিটিক্যাল ইসলাম হিসেবে বিবেচনা করা আর সম্ভব নয়— এহেন উপসংহার টানা নিশ্চিতভাবেই ত্বড়িত পদক্ষেপ ও দুঃসাহসিক কাজ।

রূপান্তরের ধারায় চলতে থাকলে ইসলামিজমের ফল হবে ইতিবাচক। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে এর মৌলিক বিশ্বাস বা আবেদন এখনো রয়ে গেছে। 'ইসলামিজম' সম্পর্কিত তর্ক-বিতর্ক যে আবারো শুরু হয়েছে, মিশর ও তিউনিশিয়ায় রাজনৈতিক উত্থান পরবর্তী ঘটনাই হলো তার প্রমাণ। পলিটিক্যাল ইসলামের সমর্থকরা ঐতিহাসিকভাবেই নানা বাধার সম্মুখীন হয়ে আসছে। বিরোধী স্বৈরশাসকরা বিভিন্ন মেয়াদে তাদেরকে বছরের পর বছর কারাদণ্ড, শারীরিক নির্যাতন এবং নির্বাসনে যেতে বাধ্য করেছে। যা কিছুই ঘটুক না কেন, কেউ ইসলামপন্থী হোক কিংবা না হোক, সবার সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনে 'ইসলাম' এখনো প্রাসঙ্গিক হিসেবে রয়ে গেছে।

ইসলামের উৎস বা রেফারেন্সের ভবিষ্যৎ কী দ্বারা নির্ধারিত হবে— তা নির্ভর করবে ইসলামের শক্তি এবং প্রেরণার উপর। মানুষ নিজের মধ্যে এই প্রেরণা ও শক্তি ধারণ করতে শুরু করেছে। তারা রাষ্ট্র পরিচালনা, স্বাধীনতা, মুক্তি, বহুত্ববাদিতা, প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নসহ আধুনিক সময়ের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে শিখেছে। শুধু তাই নয়, যে সংকট বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে, তাকেও মোকাবেলা করার সাহস করছে। আসল ব্যাপার হলো, ইসলাম নিজে থেকেই এসব বিষয়ে মূল্যায়ন বা ব্যাখ্যা দিতে পারে। আর এটাই প্রমাণ করে যে পলিটিক্যাল ইসলাম এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তবে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সন্ধিক্ষণের মুখোমুখি হচ্ছে। গতিশীল ইতিহাসের নানা পরিবর্তনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পলিটিক্যাল ইসলাম ভারসাম্য বজায় রাখতে পেরেছে। নয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ভূ-কৌশলগত পরিবেশের সাথেও নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছে।